ব্যাবিলন কথকতা

৫ম সংখ্যা
১৫ই ডিসেম্বর ২০১০

ব্যাবিলন গ্রুপ

সম্পাদক:
এমদাদুল ইসলাম

আহবায়ক:
মুহাম্মদ সাইফুল হক

বিশেষ সহযোগিতায়:
শামীমুল ইসলাম
সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:
মুকুল মন্ডল

সার্বিক শিল্প নির্দেশনায়:
স্বাধীন খান
মোস্তফা কামাল

সহযোগিতায়:
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণে:
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

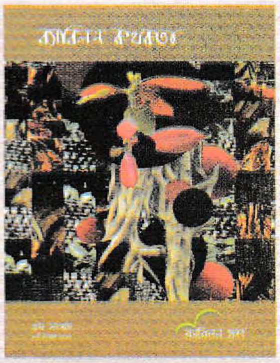

সূচীপত্র

সৃজনশীল মন ও মেধা চিরঞ্জীব হোক	সৈয়দ শামসুল হক	২
সম্পাদকীয়		৩
আত্মত্যাগ	রেবেকা সুলতানা	৫
প্রসঙ্গঃ ব্যাবিলন লোগো	মোঃ সাইদুল হক মিতন	৭
বাড়ির কাছের চেনা মানুষ	এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী	৮
আমার মা আমার স্বাধীনতা	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	১১
আশীর্বাদ	বীর বাহাদুর মিজান	১২
একটি মেয়ে	শিউলি আক্তার	১৩
নিয়ম	রোকনুল আমীন রোকন	১৩
কাল কেউটে	মাহবুব আল মামুন বিপ্লব	১৪
পদ্ম	ডাঃ জান্নাতুন নাহার	১৬
উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও নাটকীয়তায় ভরা একটি শিপমেন্ট	মুহাম্মদ সাইফুল হক	১৭
ড. কদম আলীর চাষাবাদ	শামীমুল ইসলাম	২০
মনে পড়ে তোমাকে	মোঃ ওয়ালিদ হোসেন	২৫
আমার স্বপ্ন তুমি	মিলন মিয়া	২৫
আজব শহর ঢাকা	মোঃ সোলায়মান হোসেন	২৬
মাছরাঙ্গা	শেখ মাছুম	২৬
ব্যাবিলন তুমি আমার	ইমরান খান	২৬
সুন্দরী	মোস্তাফিজুর রহমান	২৭
বর্তমান রাজনীতি	মোঃ মহানুর ইসলাম	২৭
কর্মই ধর্ম	মোঃ ফরহাদ নাসিম	২৮
বৃষ্টির গান	মোঃ বাবুল	২৮
নিজের গল্প	আশিষ	২৯
তিন কাল	মোঃ আহসান হাবীব সোহেল	২৯
শ্রাবণ ধারা নেমেছে অঝোরে	ইমদাদুল হক রনি	৩০
কথকতার বাতিঘর কাহিনী	প্রদীপ কুমার দত্ত	৩৫
দেখা হয় না চক্ষু মেলিয়া	এমদাদুল ইসলাম	৩৮
Compliance, Minimum Wage & Government Initiatives in Our RMG Sector	Mohammad Hasan	৪১
ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি		৪৩-৪৪

সৃজনশীল মন ও মেধা চিরঞ্জীব হোক

প্রতিটি মানুষের আছে সৃজনশীলতা। এই সৃজনশীলতা গল্প-কবিতা লেখা শুধু নয়, বা ছবি আঁকা বা গান গাওয়া। যে মানুষ সুন্দর করে ঘর সাজায়, যে-মানুষ কাজের ক্ষেত্রে আনন্দ আবিষ্কার করে, প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়, সেই সৃজনশীল মন থেকেই সে এ সকল করে। ব্যাবিলন গ্রুপের বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি দেখে যে, এঁরা এঁদের বিশাল কর্মীবাহিনীর ভেতরে এই সৃজনশীলতার প্রতি উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। এঁদের কর্মপরিবেশ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রসঙ্গেই যে দক্ষতা ও চারুতা আমি দেখেছি তা ওই সৃজনশীলতার উৎস থেকেই উঠে এসেছে। এমন পরিবেশ ও চেতনা আমি বাংলাদেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারি না।

এই সৃজনশীলতারই একটি প্রকাশ মনের কথা অক্ষরে শব্দে ছন্দে লিপিতে ধরে রাখা। এটিও আমার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা যে, ব্যাবিলন তার কর্মীবাহিনীকে মনের কথা বলবার ও তা সুন্দর মুদ্রণে প্রকাশ করবার সুযোগ করে দিয়েছে। সে-সকল লেখা নিয়ে যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে গত কয়েক বছর থেকে, তার প্রতিটি সংখ্যা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং রচনার আন্তরিকতা ও প্রকাশভঙ্গীর মান দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, এই কর্মীদের অনেকেই যদি লেখা সম্পর্কে আর একটু কলাকৌশলের ধারণা পেতেন তাহলে এঁদের অনেকেই সত্যিকার লেখক হয়ে উঠতে পারতেন। সেই লক্ষ্যে আমি ব্যাবিলনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি কর্মশালাও পরিচালনা করি। এ আমার আনন্দ থেকেই করেছি। কেননা আমি মনে করি, ব্যাবিলন তার কর্মীদের সৃজনশীল হতে যে উৎসাহ দিয়ে চলেছে তা অনন্য, এবং এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান ও অর্থপূর্ণ করতে পারলে কেবল ব্যাবিলনই উপকৃত হবে না, দেশের বাণিজ্যশিল্পেও একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

ব্যাবিলনের কর্মীদের লেখা নিয়ে আগের বছরগুলোর মতো এবারও একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। আমি আনন্দিত। এবং আমার শুভেচ্ছা রইলো এর লেখক ও এর প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবার প্রতি। আরো একবার আমি সপ্রশংস দৃষ্টিপাত করতে চাই ব্যাবিলনের কর্মকর্তাদের প্রতি এবং তাঁদের অভিবাদন করি এই সুন্দর উদ্যোগটি অব্যাহত রাখবার জন্য। আপনাদের সবার মঙ্গল হোক। ব্যাবিলন পরিবার আরো বড় হোক, সমৃদ্ধ হোক, কাজের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের সৃজনশীল মন ও মেধা চিরঞ্জীব হয়ে থাকুক।

সৈয়দ শামসুল হক
কথাসাহিত্যিক

সম্পাদকীয়

বিশ্ব মন্দার দীর্ঘ সুপ্রিতা, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ বাজারে বিশেষ করে তুলা-সুতা-কাপড় – এর অগ্নি মূল্য, দেশের গ্যাস ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি, অবিশ্বাস্য যানজট, চিটাগাং পোর্ট পরিস্থিতির চরম অবনতি – এ যেন এক অন্তঃহীন দুঃসংবাদ তালিকা। সবই মন্দ, সবই হতাশা? এত সব পিলে চমকানো দুর্যোগ কথার বিপরীতে আশা জাগানো কিছুই কি নেই? আছে বৈকি! এত জ্বরা, এত দুর্দশা নিয়েও কিন্তু প্রিয় দেশটা আমাদের চলছে। উন্নতিও করছে এখানে ওখানে। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানী কমেনি, বরং বেড়েছে। পরিবেশ অনুকূল হলে অবশ্য তা আরো অনেক বাড়ত।

বস্ত্র শিল্পে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার সামান্যই করতে পারছি আমরা। বৈরী আবহাওয়ায় হাল ছেড়ে দেয়া যেমন বিচক্ষণ নাবিকের কাজ নয়। বরং শক্ত করে হাল ধরে গন্তব্যে পৌঁছার জানা অজানা সব কৌশল প্রয়োগই এখন সবচে করণীয়। ব্যাবিলনে আমরা সবাই তাই করছি। ব্যাবিলনের নৌবহরে ছোট বড় অনেক জাহাজ রয়েছে। আর এদের কাপ্তানরা কেউই হাল ছাড়েনি। তান্ডব এড়িয়েছে কৌশলে। দমকা হাওয়ায় পালের রশি দু'একটা ছিড়ে একটু বেসামাল হলেও পরে সামলে নিয়েছে। কখনও ঝড়ের গতি পালে লাগিয়ে জাহাজের বেগ বাড়িয়েছে। এসব কুশলী নাবিকদেরকে আমার ধন্যবাদ।

আশা-নিরাশা, সুযোগ ও দুর্যোগ কোনটাই ব্যাবিলন কথকতাকে এর নিঃশ্চিন্ত হয়ে আসা আসন থেকে টলাতে পারেনি। কথকতার লেখক-লেখিকারা এখন এক প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। এদের অংশ গ্রহণের মান বেড়েছে সংখ্যায় ও উৎকর্ষতায়।

চলতি বছরটা ব্যাবিলন কথকতা-এর লেখক-লেখিকার জন্য ছিল একটা চমৎকার অভিজ্ঞতার বছর। বরেণ্য কবি ও লেখক জনাব সৈয়দ শামসুল হক গত সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তীতে কথকতার লেখক-লেখিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার। ভেবেছিলাম এটা তার সাময়ীক আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পরে বুঝেছি এ সব গুণী মানুষের পরিমাপ করি এ যোগ্যতা আমার কোথায়? উনার তাগিদেই এর পর একদিন সেই দিনটি এল যেদিন তিনি দু'তিন ঘন্টা ধরে অমূল্য রতন বিলিয়ে গেলেন ব্যাবিলন কথকতা – এর পিপাসু লেখক লেখিকাদের মধ্যে। কত সহজ ভাষায়ইনা তিনি গদ্য ও পদ্য লিখার রীতিনীতি বুঝিয়ে দিলেন। অংকের হিসাবে কবিতা ও ছড়াকে ছন্দবদ্ধ করতে পেরে সেদিন উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থিরা মুগ্ধ হয়েছিলেন – কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন জনাব সৈয়দ শামসুল হকের কুশলী বিতরণে। ওঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই।

এবারের সংখ্যায় পাঠানো তার উদ্দিপনা জাগানো শুভেচ্ছা কথা ব্যাবিলন কথাকতা – এর সাথে তাঁকে আত্মার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। বারবার ধন্যবাদ দিয়ে কথকতার সাথে তাঁর সম্পর্ককে ফিকে করে দিতে চাইনা।

ব্যাবিলন জগতে এ বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হল ব্যাবিলন শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের অনুষ্ঠানটি। ২৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ব্যাচের অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড: এস এম নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির আসনে বসেছিলেন বি.জি.এম.ই.এ – এর প্রথম সহঃসভাপতি জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দীন। উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানটিকে উৎসাহিত ও সার্থক করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়েছিলেন দেশী-বিদেশী বায়িং হাউজ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে প্রতিনিধিরা। তাদের প্রেরণা জোগানো অকপট বক্তব্যে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ও ব্যাবিলন ম্যানেজমেন্ট সেদিন তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সমুন্নত রাখা ও তার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে উৎসাহ পেয়েছেন অনেক।

হেমায়েতপুরস্থ ব্যাবিলন মেডিক্যাল সেন্টার – এর বেশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এ বছর। এলাকার স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশী মানুষের আশা পুরন হয়েছে কেন্দ্রটিতে নতুন কিছু প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা যন্ত্র বসাবার মাধ্যমে। আধুনিক Ultra Sonogram ও ECG মেশিন সংযুক্ত হয়ে মেডিক্যাল সেন্টারটি এখন তার সেবার মান ও পরিধি বাড়াতে পেরেছে। সেন্টারটিতে অদুর ভবিষ্যতে X-Ray ফটো গ্রহণ যন্ত্র বসানোর অঙ্গীকার রয়েছে আমাদের।

এ বছরে ঘটে যাওয়া আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা –

- চট্টগ্রামে Trendz - এর প্রথম আউটলেট উদ্বোধন ।
- রবি কর্তৃক Trendz - কে Award of Excellence প্রদান ।
- Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) - এর প্রতিনিধিদের ব্যাবিলন সার্ট ও ট্রাউজার ফ্যাক্টরি পরিদর্শন ।
- বেলজিয়াম থেকে আগত World Solidarity Movement সদস্যদের ব্যাবিলন হেড অফিসসহ সার্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন ।

ঈদুল আজহার ছুটির ঠিক আগ সময়ে ব্যাবিলন গ্রুপের মূল কারখানা ভবন এক অবিস্মরনীয় নাটকীয়তার মুখোমুখি হয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় সফরে আসা তুর্কী (Turkish) প্রধানমন্ত্রী পত্নী Her Excellency Madame Emine Erdogan – এর এক মাত্র পোশাক শিল্প পরিদর্শন তালিকায় উঠে এসেছিল ব্যাবিলনের নাম । ১৪ নভেম্বর পড়ন্ত সকালে তাঁর পরিদর্শন সম্পূর্ন ঝুঁকিমুক্ত ও মসৃন করার লক্ষ্যে ব্যাবিলনের উচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দসহ সরকারের স্পেশাল সিকিউরিটি বাহিনীসহ অনান্য সংস্থা ও বি.জি.এম.ই.এ. কর্মকর্তাবৃন্দ যারপর নাই খেটেছেন । আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর চৌকশ সদস্যদের ঘন ঘন পদচারনায় ও নির্দেশনায় ক'টি দিন ব্যাবিলন মূল সার্ট কারখান ও কর্পোরেট অফিস মুখরিত হয়েছিল । সব প্রস্তুতি সম্পন্ন । ১৪ নভেম্বর সকালে ব্যাবিলন যখন VVIP অতিথিকে বরণ করার জন্য সম্পূর্ন প্রস্তুত তখন অপ্রস্তুত করা দুঃসংবাদটি এলো । সফরটি বাতিল হয়েছে কারন ১৪ নভেম্বর ছিল বিরোধীদলের আচমকা ডাকা হরতালের দিন । ব্যাবিলনের সবাই হতাশ হয়েছে বিশেষ করে ডি.জি.এম. হাসান সাহেবসহ অন্যান্য যারা ঘুম হারাম করে খেটেছেন এই অসামান্য পরিদর্শনটির জন্য । আমি বলি কষ্ট পেলেও হতাশ হবার কিছু নেই । কারণ প্রাপ্তিটা কিন্তু আমাদের হয়েছে । ব্যাবিলন তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর পরিদর্শন যোগ্য বিবেচিত হয়েছে এটাতো এখন বাস্তবতা । ব্যাবিলন ভবিষ্যতে এমন অনেক উচ্চমার্গের দেশী বিদেশী অতিথিদের বরণের জন্য পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকবে সেটাই আশা করি ।

এছাড়া আমাদের অবনী নীটওয়্যার লিঃ এবারও Best Friendly Factory Award 2010 পেয়েছে BKMEA এর পক্ষ থেকে । AKL–কে অভিনন্দন ।
ব্যাবিলন শার্ট ফ্যাক্টরি পেয়েছে TEMA – এর কাছ থেকে Most Improved Supplier Award.

It appears like the newly introduced English Section has failed to attract writers so far. We have a lone piece in this issue from Mr. Hasan only. Thanks to him. I wonder if we will have to discontinue this section in future. Only time will tell.

পরিশেষে ব্যাবিলন কথকতাকে পঞ্চম বারের মতো পাঠক সমক্ষে হাজির করতে পারার নেপথ্যে থাকা সকল কলা–কুশলী, লেখক–লেখিকা, আয়োজকদেরকে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ।

সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা । শুভেচ্ছা বড় দিনের ও নতুন ইংরেজী সাল ২০১১ এরও ।

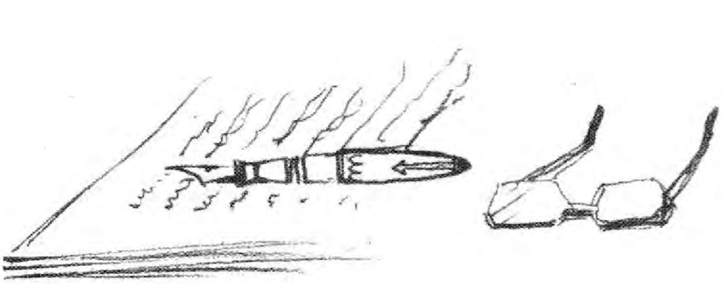

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ

তারিখ ঃ ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১০

আত্মত্যাগ

রেবেকা সুলতানা
প্রশিক্ষক, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

পাহাড়-পর্বতময় একটি স্থান। চারদিকে মরুভূমি। লোকজনের কোন বসতি নেই। কি করেই বা মানুষ সেখানে থাকবে? সেখানে যে পানির চিহ্ন মাত্র নেই। পানির অভাবে গাছপালাও নেই বললেই চলে। তবে কিছু খেজুর গাছ কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। মাথার উপর সূর্য প্রচন্ড উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতে পশ্চিম গগনে অস্ত যায়। রাতের বেলা মরুভুমিতে ঠান্ডা পড়ে। শীত শীত ভাব থাকে। দিনের বেলা লু হাওয়া বইতে থাকে। সে সময় বাইরে বের হওয়াটা বিপজ্জনক। সেই জনশূণ্য স্থানে একদিন এক পুরুষ লোক এলেন। সঙ্গে তার স্ত্রী ও শিশু পুত্র। তিনি এসেই আবার চলে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। স্ত্রী তো স্বামীর এ ধরনের আচরণে অবাক। তিনি বললেন,

– 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে নেবেন না'?

স্বামী বললেন, 'না। তোমাদের দু'জনকে এখানেই থাকতে হবে'।

স্ত্রী বললেন, 'এখানে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি আপনার নিজের'?

স্বামী বললেন, 'না। আল্লাহ্‌র হুকুমেই তোমাদের রেখে যাচ্ছি'।

এ কথা শুনে স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাঁর চেহারায় এতক্ষণ যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল তার অবসান হল। তিনি নিশ্চিত ভাবে বললেন, 'এবার আমার আর কোন চিন্তা নেই। কেননা আল্লাহ্ যখন আমাদেরকে এই জনশূণ্য স্থানে রেখে যেতে বলছেন তখন তিনি আমাদের কোন ক্ষতি হতে দেবেন না। তিনি আমাদের প্রতিপালন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন'।

স্বামী কিছু খেজুর ও পানি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের জন্য রেখে সজল চোখে বিদায় নিলেন। যতক্ষণ তাঁর উট দেখা যাচ্ছিল স্ত্রী সেদিকে চেয়েছিলেন। এক সময় তাঁর উট মরুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। যতক্ষণ খেজুর ও পানি ছিল স্ত্রীর জন্য কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেটুকু খাবার আর কতক্ষণই বা থাকে। এক সময় সে খাদ্য আর পানি শেষ হয়ে গেল। এবার তো মহাবিপদ! শিশুটি পানি চাচ্ছে। পানির জন্য সে কাঁদছে। কিন্তু কোথাও পানি নেই। এদিকে পানির তৃষ্ণায় শিশুটি কাতর হয়ে পড়ছে। মা পানির খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। একবার ঐ পর্বতে দৌড়ে যাচ্ছেন যদি পানি পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! সেখানে কোন পানি নেই। আবার এই পর্বতে দৌড়ে আসছেন। মনে হয় সেখান পানি আছে। কিন্তু সেখানেও পানি নেই। এভাবে সাতবার দু'পর্বত দৌড়া-দৌড়ি করার পর ছেলের কাছে এসে দেখলেন, সেখানে একটি পানির ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। শিশুটির পায়ের আঘাতে ঝরনাটির উদ্ভব হয়েছে। পানি চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি সে পানিকে সংরক্ষণের জন্য চারদিকে বালু ও পাথর দিয়ে বাঁধ দিলেন। কিন্তু শুধু কি পানি পান করে জীবন চলে? খাবারও দরকার। একজন অসহায় মা কোথায় খাবার পাবেন? কিন্তু তিনি পুরাপুরি আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন।

পানির ঝরনার কারণে দুর থেকে সেখানে নানা ধরনের পাখি আসতে থাকে। মরুভূমিতে যারা চলাচল করে তারা কোন এলাকায় কাকসহ অন্যান্য পাখি উড়তে দেখলে বুঝতে পারে সেখানে কোন পানির ঝরনা আছে। একদল লোকের কাফেলা সে স্থান থেকে বেশ দুর দিয়ে যাওয়ার সময় ঐ স্থানে পাখিদের চলাচল লক্ষ্য করতে থাকে এবং সেদিকে চলতে শুরু করে। কাছে এসে তারা সেখানে পানির ঝরনা দেখতে পায়। তারা কৌতূহল ভরে দেখে একাকি মা ও তার শিশু পুত্রকে। তারা ভাবলো এই মরুময় পার্বত্য এলাকায় পানির যে ঝরনা দেখা যাচ্ছে তার মালিকানা হয়তো ওই মহিলার হাতে। তারা খুব বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে তাঁর কাছে তাদের আবেদন পেশ করল। তারা বলল,

– 'আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা কাফেলার এই সব নারী ও পুরুষ আপনার এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকবো আর আপনাকে এই এলাকায় অধিপতি হিসেবে মেনে নিব। আপনি যে আমাদের এখানে থাকার সুযোগ ও পানি ব্যবহার করতে দিবেন সে জন্য আপনাকে আমরা খাজনা দিব'।

মা তাদের কথা শুনে রাজি হয়ে গেলেন। তারা তখনই সঙ্গে থাকা খেজুর ও রুটি উপঢৌকন হিসেবে মায়ের কাছে পেশ করল। মা ও পুত্র তা খেলেন। তাঁদের খাবারের জন্য আর কোন চিন্তাই করতে হলো না। ওই সব লোকজন মায়ের জন্য ঘর তুলে দিল। আর তারা মা ও পুত্রের খাবারের ব্যবস্থা করে দিল। তারাও ঘর তুলে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করল। মা বুঝতে পারলেন, আল্লাহ সত্যিই প্রতিপালক। তাঁর উপর যারা পুরোপুরি নির্ভর করে তাদের তিনি অবশ্যই রক্ষা করেন। কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

বছর ঘুরে নতুন বছর আসে। সেই যে স্বামী চলে গেছেন তারপর তাঁর আর কোন খবর নেই। অনেক বছর পর একদিন তিনি আবার সেখানে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি ভীষন অবাক। বেশ কিছু লোক সেখানে বসবাস করছে। তাঁর স্ত্রী তাকে দেখেই সাদরে ঘরে নিয়ে গেলেন। ছেলে বেশ বড় হয়েছে। সে এখন ১২-১৩ বছরের ফুটফুটে এক কিশোর। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে। এই সময় স্বামী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে কোরবানি দিতে বলেছেন। তিনি ভেবে দেখলেন, তাঁর পুত্রই তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু এ কথাতো স্ত্রীকে বলা যায় না। তিনি যদি রাজী না হন। আর পুত্রকেও বলতে পারছেন না। কিন্তু তিনি আল্লাহর আদেশ অবশ্যই পালন করবেন। তাই তিনি একটি ধারালো ছুরি হাতে পুত্রকে সাথে করে একটি নির্জন স্থানে এলেন। তারপর পুত্রের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধলেন। পুত্র জিজ্ঞাসা করলেন,

– 'আব্বা আপনি কি করতে চাচ্ছেন'?

পিতা জবাব দিলেন; 'আমি তোমাকে জবেহ্ করতে চাচ্ছি'।

পুত্রতো অবাক! এ আবার কেমন কথা? কোন পিতা কি তার পুত্রকে হত্যা করতে পারেন?

– 'আব্বা কোন্ অপরাধে আমাকে জবেহ্ করবেন'? তিনি কারণ জানতে চাইলেন। পিতা স্বপ্নের কথা বললেন।

পুত্র বললেন, 'আল্লাহ্ যখন চাচ্ছেন তখন আপনি অবশ্যই আমাকে জবেহ্ করুন। আমি এ সময় শান্তভাবে থাকব। ধৈর্য্য ধারণ করবো। কেননা আল্লহ ধৈর্য্যশীলদের ভালোবাসেন'।

পিতা পুত্রের কথায় খুশি হলেন। পুত্র নিজ থেকেই তার হাত পা বেঁধে ফেলতে বললেন। বাবা তাই করলেন। পুত্রকে জবেহ্ করার জন্য মাটিতে শোয়ালেন। পিতা নিজের চোখে কাপড় বেঁধে নিলেন। কেননা জবেহ করার সময় যদি পুত্রের মুখের প্রতি তার নজর পড়ে এবং পিতৃস্নেহ জেগে উঠে তবে তিনি হয়তো জবেহ্ করতে নাও পারেন। তিনি পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু ছুরির ধার পুত্রের গলায় বসছে না। তিনি ধারালো ছুরি পাথরের উপর ছুড়ে মারলেন। পাথর কেটে দু'টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু সেই ধারালো ছুরি তার পুত্রের নরম কচিগলা কাটতে ব্যর্থ হচ্ছে। বার বার চেস্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তিনি শেষবারের মত পুত্রের গলায় ধারালো ছুরি চালালেন। এবার মনে হলো জবেহ্ হয়ে গেছে। চোখের কাপড় খুললেন। দেখেন, পাশে ছেলে দাঁড়িয়ে। আর একটি দুম্বা সেখানে জবেহ্ হয়ে গেছে।

গায়েবি আওয়াজ এল,

– 'হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছো! আল্লাহ্ তোমার কোরবানি কবুল করে নিয়েছেন'।

বুঝতেই পারছেন ওই পিতা হচ্ছেন মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ:) আর তাঁর পুত্র হচ্ছেন আল্লাহর নবী হযরত ইসমাঈল (আ:), মা হচ্ছেন হযরত হাজেরা (আ:) আর ঐ স্থানটি হচ্ছে পবিত্র মক্কা শরীফ। পানির ঝরনা হচ্ছে জমজম্ কূপ। আর হাজেরা (আ:) যে দুটি পর্বতের মধ্যে ছোটাছুটি করেছিলেন তার নাম সাফা ও মারওয়া।

আল্লাহ পাক হযরত হাজেরা (আ:)-এর ছোটাছুটি কবুল করে নিয়ে এ দু'টি পর্বতের মধ্যে ৭ বার ছোটাছুটি করাকে হাজীদের জন্য করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইব্রাহীম (আ:) এর কোরবানি আল্লাহ-এর কাছে এতটাই পছন্দনীয় হয়েছে যে ঈদ-উল-আযহার সময় সামর্থবান মুসলমানদের পশু কোরবানি করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গঃ ব্যাবিলন লোগো

মোঃ সাইদুল হক মিতন
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং
অবনী নীটওয়্যার লিঃ

ব্যাবিলন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রুপ অব কোম্পানি। এমন একটি স্বনামধন্য কোম্পানির লোগো (Logo) নির্ধারণের কাজে নিজের সম্পৃক্ততার কথা মনে হলে নিজেকে বেশ গর্বিত মনে হয়। ব্যাবিলনকে আমি চিনি ১৯৯০-৯১ সাল থেকেই। আমি তখন ৭ম কি ৮ম শ্রেণীতে পড়ি। আমার মামা আমজাদ হোসেন বুলবুল ছিলেন ব্যাবিলনের প্রথম সারির একজন কর্মী। দীর্ঘ ২০ বছর তিনি ব্যাবিলন-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বলা যায় তার সূত্র ধরেই আমার বা আমার পরিবারের অনেকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ এখানে হয়েছে। এই সেই ব্যাবিলন যার শুধু গল্পই শুনতাম। আর এখন আমি এর এমন একজন কর্মী যার কিনা ব্যাবিলন লোগো নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ব্যাবিলন লোগো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। কিন্তু এর পরিপূর্ণতা এসেছে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে। আমাদের ফ্রান্সের ক্রেতা JULES ব্যাবিলনের লোগো চাইলো অবনী নীটওয়্যারকে Best Performance Supplier Certificate দেয়ার জন্য। মেইলটা আমার কাছে আসার পরই আমার মধ্যে একটা নতুন কৌতুহল জেগে উঠে। কিভাবে ব্যাবিলন লোগোকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় তা নিয়ে অনেকের সাথেই আলোচনা করলাম এবং সবাই সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিলেন। বিষয়টা একটু জটিল ছিল। কারণ একটা সুন্দর লোগো খুঁজে পাওয়া এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা একটু কষ্টকরই বটে। আমাদের পরিচালক আবিদ স্যারকে বিষয়টা জানানোর পর উনার উৎসাহ এবং আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যাবিলন লোগোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। লোগো নিয়ে কাজ করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা ছিলেন হাদি ভাই, সাইফ, নূর আলম এবং আমি - মিতন। আমাদের এই কমিটির প্রধান ছিলেন আবিদ স্যার। স্যার-এর নির্দেশেই সুন্দর, অর্থবহ, গ্রহণযোগ্য একটি লোগো খুঁজে বের করার কাজে আমরা সবাই লেগে পড়ি। আমাদের সাইফ-এর বন্ধু এমদাদ সাহেব একজন প্রফেশনাল ডিজাইনার। Energy Pack, রস, Sweat Agrobate, Jarin Field সহ আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের লোগো তার হাতেই করা। এই ডিজাইনার এমদাদ সাহেবের করা বিভিন্ন লোগো নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। আমরা আরও তিনজন ডিজাইনারকে সম্পৃক্ত করি। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় তাদেরকে আমরা বাদ দিয়ে দেই। এমদাদ সাহেবের করা ডিজাইনগুলোকে যাচাই বাছাই করার পর কয়েকটি নির্বাচিত লোগো Board of Directors - এ উপস্থাপন করা হয়। বেশ কিছু দিন পরে আমরা জানতে পারি উপস্থাপন করা লোগো থেকে একটি স্যারদের পছন্দ হয়েছে। খবরটা শোনার পর মনে হয়েছে 'আমাদের লেগে থাকাটা সার্থক হয়েছে'। প্রায় তিনমাস আমরা এই লোগো নিয়ে কাজ করি এবং লেগে থাকি। এখন এই লোগো ব্যাবিলনের প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান করে নিয়েছে এবং পূর্ণতা দিয়েছে ব্যাবিলনকে। সময়ের প্রয়োজনে আমাদের প্রস্থান হবে, নতুনরা আসবে। ব্যাবিলন কথকতায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি ঠাঁই পায় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হবে, উৎসাহিত হবে এবং আমাদের মত কর্মীদের মনেও রাখবে।

বাড়ির কাছের চেনা মানুষ

এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল, হেড অফিস

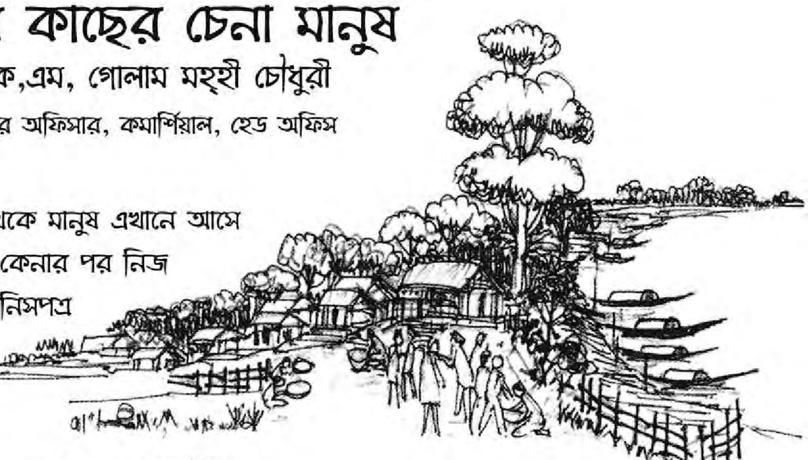

হালিমগঞ্জ বেশ বড় গঞ্জ। বহু দূর দুরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসে বাজার সদাই করতে। চাল, ডাল, তরি-তরকারী কেনার পর নিজ বউ ঝিদের জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী আর সৌখিন জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায় তারা। গঞ্জের বেচা কেনা শুরু হয় সন্ধ্যার পরে। গোমতীর ওপাশ থেকে একটা একটা করে নৌকা এ পাশে ভিড়তে থাকে। কুপির চঞ্চল শিখার সাথে তাল রেখে শুরু হয় বেচা বিক্রি।

হালিমগঞ্জের যে দিকটায় গোমতীর পাড় সবচেয়ে উঁচু সেখানে রহিম মিয়ার দোকান। গঞ্জের অন্য সব জায়গায় যে দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসে তাদের জন্য এ জায়গাটা ঈর্ষণীয়। তার প্রথম কারণ হল জায়গাটাতে পানি জমে কাদা হয়না, আর দ্বিতীয় কারণ হল এর উপর বিশাল এক ছাতিম গাছ। গাছটা যেন অকৃত্রিম মায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিম মিয়ার দোকানের পাশে।

রহিম মিয়া এ গঞ্জের সবচেয়ে পরিচিত মুখ। পঞ্চাশোর্ধ মানুষ। মুখের চামড়ায় কুচি ধরলেও শরীর বেশ শক্ত সামর্থ্য। তার ব্যবসা খুবই সাধারণ। ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা সামগ্রী আর 'অ আ ক খ' শেখার বই। এছাড়াও বিক্রি করেন আদর্শলিপি। তরুণীদের জন্য ফিতা, ক্লিপ, আয়না ইত্যাদি। প্রতি বুধবার মহাজনের আড়তে যান রহিম মিয়া। সেখান থেকে সপ্তাহের মালামাল একবারে নিয়ে আসেন। দোকানের সামনে তিনি ছোট একটা সাইন বোর্ড লাগিয়েছেন।
তাতে লেখা – →

আপনার সন্তানের জন্য বই কিনিয়া
নিয়া যান, তাহাকে লেকাপড়া শেখান

সাইন বোর্ডটা তার নিজের হাতে লেখা। লেখাপড়া করেছিলেন প্রাইমারি পর্যন্ত। সম্ভবত এ কারণেই সাইন বোর্ডে দু একটা বানান ভুল দেখা যায়।

আজ রহিম মিয়ার দোকানে একটু পরিবর্তন দেখা গেল। গঞ্জের পরিচিত মুখ রহিম মিয়ার দোকান আজ দুপুরের পর থেকেই বন্ধ। এখন সন্ধ্যা। রহিম মিয়া গঞ্জের যে পাশটায় মানুষের সমাগম সবচেয়ে কম সেখানে একাকী বসে আছেন। চারিদিকে বেশ অন্ধকার। এখান থেকেও গঞ্জের কুপির আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রহিম মিয়ার সে দিকে কোন খেয়াল নেই। তিনি এক দৃষ্টিতে গোমতীর পানির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সাজু মাঝি এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সারাদিন খেয়া পারাপারের কাজ করে সে গঞ্জে এসেছে চাল কেনার জন্য। রহিম মিয়াকে একা বসে থাকতে দেখে সে এগিয়ে এল।

– 'কে এইডা রহিম মিয়া না'?
তার প্রশ্নে রহিম মিয়ার নিরবতা ভাঙল না। আবার হাঁক দিল সাজু মাঝি–
– 'রহিম ভাই'?
এবার চমক ভাঙ্গে রহিম মিয়ার। কিন্তু জায়গা ছেড়ে উঠে আসেন না তিনি। সাজু মাঝি তার পাশে গিয়ে বসে।

– 'কি ব্যাপার রহিম ভাই! দোকান খুল নাই'?

– 'না' ।

– 'ক্যান কি হইছে'?

– 'কি আর হইব । নসীবে যা ছিল তাই হইছে । ঐ দিন মহাজনের থেকে মাল আনার পর এ কয়দিনে যা বেচা বিক্রি হইছিল তার টাকাটা হারাইয়া ফালাইছি' ।

– 'কও কি'? চমকে ওঠে সাজু মাঝি ।

– 'পরশুদিন মাল আনতে আবার মহাজনের কাছে যাওন লাগব । কিন্তু টাকাটা হারাইয়া ফেললাম' ।

সাজু মাঝি রহিম মিয়াকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝে উঠতে পারে না। কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করে তারপর চলে যায় নিজ কাজে । আবার রহিম মিয়া একা হয়ে যায় । আকাশটা এখন বেশ ভারী আর মেঘলা । বিকালেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল । এখন আবার হবে বলে মনে হচ্ছে ।

রহিম মিয়ার স্মৃতিতে আজ অনেক কথা একে একে ভেসে উঠছে । সে সব স্মৃতি খুব আবছা । মনে পড়ে তিনি যখন সাত আট ছুঁই ছুঁই তখন প্রথম বাবার হাত ধরে এ গঞ্জে এসেছিলেন । তখন থেকেই এই নদী আর এই গঞ্জের সাথে তার মিতালী । কতদিন যে মায়ের ট্যাক থেকে পয়সা নিয়ে পালিয়েছেন বাবু ঘোষের দোকানের বাতাসা খাওয়ার জন্য । কিভাবে যে দিনগুলো গত হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি ।

রহিম মিয়ার বাবা হাফিজ মিয়া বর্গাচাষী ছিলেন। তার মৃত্যু হয়েছিল অকস্মাৎ । তিন দিন ধরে কোন খোঁজ-খবর নাই। হঠাৎ একদিন শোনা গেল গোমতীর জলে তার লাশ ভেসে উঠেছে ।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে । ঠান্ডা বাতাসও বইছে । তার উচিত এখান থেকে উঠে যাওয়া । তিনি বয়স্ক মানুষ । ঠান্ডা লেগে বড় কোন অসুখ বাধতে পারে । আজ বোধ হয় গঞ্জের দোকানিদের বেচা-কেনা ভাল না । বৃষ্টির কারণে অধিকাংশ লোকই বাড়ির পথ ধরছে । অনেক দোকানের কুপিও ইতিমধ্যে নিভে গেছে ।

রহিম মিয়ার দৃষ্টি এখনও নদীর জলে । কিছুক্ষণ ধরে স্ত্রীর চেহারাটা তার চোখে ভাসছে । তার স্ত্রী রাশেদার গায়ের রং খুব একটা ফর্সা ছিল না । কিন্তু চোখ দুটো ছিল অস্বাভাবিক বড় আর মায়াময় । এই হালিমগঞ্জেই প্রথম দেখেছিলেন রাশেদাকে। তারপর কি যেন হয়ে গেল তার মাঝে, কোন অদৃশ্য যাদুমন্ত্র যেন তাকে বাধ্য করল রাশেদাকে আবার খুঁজে বের করতে । এরপর বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন । রহিম মিয়ার বয়স তখন পঁচিশ আর রাশেদার চৌদ্দ কি পনের । দরিদ্র, কন্যাদায়গ্রস্থ পরিবারের মেয়ে হওয়ায় পাত্রীপক্ষ অমত করেনি ।

রাশেদার সাথে রহিম মিয়ার দিনগুলো ছিল বড় সুখের। আকাশে মেঘ ডাকলে, বৃষ্টি হলে প্রায় উন্মাদ হয়ে যেত রাশেদা। রহিম মিয়ার হাত ধরে টেনে বৃষ্টিতে নিয়ে আসত । বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রীতিমতো নাচতো সে । বেশি ভাল ছিল বলেই বোধহয় বেশি দিন টিকলো না । বিয়ের আট বছরের মাথায় মারা গেল । দু'দিনের জ্বর । কিছু বুঝে উঠার আগেই সব শেষ । রেখে গেল পাঁচ বছরের খুকী পরীকে ।

বৃষ্টিতে রহিম মিয়ার মাথা, জামা সব ভিজে একাকার । বৃষ্টি এখন বেশ জোরে-সোরে নেমেছে । দূরে কোথাও একটা বাজ পড়ল । কিন্তু তাতেও রহিম মিয়ার ঘোর ভাঙল না । তার মনে এখন পরীর ছবি । সেই ছোট্ট – পরী । সত্যিই পরীর মত সুন্দর ছিল তার মেয়ে । প্রায়ই একাকী চলে আসত গঞ্জে, বাবার দোকানে । মা মরা মেয়েকে সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব আদর দিয়ে মানুষ করেছেন । পরীর বয়স যখন পনের তখন নানা সম্বন্ধ আসতে থাকলো । ভাল মন্দ দেখে বিয়েও দিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য, টিকলো না পরীর সংসার । পরীর স্বামী হাশেম কাজ কর্ম করতো না । বন্ধুদের আড্ডা আর জুয়ার আসরই ছিল তার জীবন । বিয়ের চার বছরের মাথায় টাকার লোভে দ্বিতীয় বিয়ে করল হাশেম । স্বামীর চার বছরের অন্যায় পরী সহ্য করতে পারলেও দ্বিতীয় বিয়ে সহ্য করতে পারেনি । যে গোমতীর উপর দিয়ে নৌকায় চড়ে সে শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিল, চার বছর পর সেই

নদী পাড়ী দিয়ে ফিরে এল । কোলে দুই বছরের ছেলে রতন ।

এই মেয়ে আর নাতি রতনকে নিয়ে এখন তার সংসার । তার ছোট কারবারে যা আয় হয় তা দিয়ে কোন মতে দিন চলে যাচ্ছিল । কিন্তু রতনটা যত বড় হচ্ছে তত জেদী হচ্ছে । এখন সে প্রতিদিন বায়না ধরে গরুর গোশত দিয়ে পোলাউ খাবে । রহিম মিয়া বড় দরিদ্র মানুষ । শাক ভাত খেয়ে তার দিন চলে । এত উচ্চাভিলাষ তাদের সাজে না । এটা তিনি বোঝেন । পরীও বোঝে । কিন্তু রতন বোঝে না । তার পোলাও গোশত চাই-ই চাই । অগত্যা ঠিক করলেন এই হাটবার শেষ করে যা টাকা পাবেন তা দিয়ে সাহস করে কিনে ফেলবেন পোলাওয়ের চাল, ঘি আর গরুর গোশত ।

বৃষ্টি শেষ। কতক্ষণ যে বৃষ্টিতে ভিজলেন তার হিসাব নেই । ভেজা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে, তবুও বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না । কেবলই মনে হচ্ছে বাড়ি ফিরলে তো রতনের করুণ মুখ দেখতে হবে । কষ্টে মরে যেতে ইচ্ছে করল তার । এতগুলো টাকা কোথায় হারালেন, কিভাবে হারালেন কিছুই মনে পড়ছে না । অনেক কষ্টে ভেজা শরীরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি । ঠিক করলেন বাড়িতে ফিরবেন না । ছাপড়ার এক কোনায় ভেজা শরীর নিয়েই ঘাপ্টি মেরে শুয়ে থাকবেন । জীবন থেকে পালাতে হবে তাকে । পালাতে হবে পরী, রতন আর অতীত স্মৃতি সব কিছু থেকে ।

কাঁপতে কাঁপতে দোকানে গিয়ে উঠলেন তিনি । ছাপড়ার দোকানে গদীর মত করে রাখা কাপড়ের গোছাটাকে বালিশের মত পেতে শোয়ার জন্য জায়গা করলেন, আর ঠিক তখনই ছাতিম গাছের তলায় আবছা কি যেন দেখতে পেলেন । কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি । আশ্চর্য তার টাকার পোটলাটা ছাতিম গাছের শিকড়ের আড়ালে পড়ে আছে । মুহূর্তের মধ্যে তার মনে হল হয়তো অসাবধানতাবশত: পোটলাটি এখানে পড়ে গিয়েছিল । টাকাগুলো গুণে দেখলেন । টাকার অংক ঠিকই আছে । পলিথিনের পোটলার কারণে বৃষ্টিতে টাকা নষ্টও হয়নি । রহিম মিয়া আনন্দে আর একবার কেঁদে ফেললেন । ততক্ষণে আকাশে মেঘ কেটে গেছে ।

আমার মা আমার স্বাধীনতা

মোঃ জোবায়দুল ইসলাম
জুনিয়র অফিসার, মার্কেটিং, ব্যবিলন ওয়াশিং লিঃ

মাগো–
হঠাৎ ঘুম ভাঙলে – তোমাকে দেখি–
তোমার বুক জমিনে – দৃশ্যমান – চিত্রপট – অনুচ্চারিত ভাষা –
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আমাকে ছিটকে ফেলে।
সাঁতরাতে সাঁতরাতে বড্ড ক্লান্ত মা।
গ্রোথিত শিকড়ে পুরনো আগাছাগুলো এখনো –
উপড়ে ফেলা হয়নি।

কীট পোকাদের চোখ এখনো হায়েনার মত –
নখের ডগায় তিক্ততা জমতে জমতে বিষাক্ত ছোবলগুলো –
বেড়ে উঠছে। পুরনো ক্ষত এখনো শুকায়নি – মা।
তুমি কেমন করে ক্ষমা করবে তাদের?

দেখলাম তুমি কাঁদছ – কান্নার শব্দ চারদিকে বিস্তৃত।
এ আমি দেখতে চাইনা মা।
তোমার প্রতি ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে ইতিহাসের
ক্রমধারায় তুমি ৪৭, ৫২, ৫৪, ৬৬, ৬৯, ৭০,
তুমি ৭১।
তুমি...
তুমি অর্জিত স্বাধীনতা।

মাগো–
তুমি যখন কাঁদছিলে –
তোমার প্রতিটি ফোঁটা অশ্রুজল গড়িয়ে গড়িয়ে –
অ, আ, ক, খ –
আমার প্রতিটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা।

মাগো, তোমার প্রতিটি শেখানো বুলি –
আজ সারা বিশ্বের মাতৃভাষা।

আমার মা যদি কাঁদে – পৃথিবীর সব স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে –
পৃথিবী ভূকম্পিত হবে –
পৃথিবীর সব মায়েদের বুক আত্ম-হাহাকার করবে।
আমার মা যদি অনাহারে থাকে –
তোমাদের পেট অভুক্ত থেকে যাবে –
আমার মা যদি শীতে কষ্ট পায় –
তাঁর দীর্ঘশ্বাস এসে তোমাদের উপর পড়বে –
শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্ম স্থবির হয়ে পড়বে –
শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাস্কর্য – স্থাপত্য বিমলিন দেখাবে।

মা যদি কাঁদে –
আমার স্বরবর্ণ – ব্যঞ্জন বর্ণমালায় শোভিত
প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক জলে ভিজে যাবে।

মা, তাকিয়ে দেখ –
তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা তোমার পাশে জড়ো হয়েছে –
এই তোমার সালাম
এই তোমার রফিক – এই তোমার আসাদ – মতিউর –
তোমার সমস্ত ভাষা সৈনিক, মুক্তি সৈনিক, বুদ্ধিজীবী, কবি,
সাহিত্যিক – বিপ্লবী নেতারা – সবাই আজ তোমার পাশে –
তোমার ফসল তো আমরাই –
মা, আর কাঁদেনা –
ইতিহাসে পাপীদের স্থান নেই –
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না – ।
মায়ের চোখে হাসি – বিস্ফারিত হাসি –
আরেকটি স্বাধীনতার – আরেকটি মুক্তির...

আশীর্বাদ

বীর বাহাদুর মিজান
অডিটর, কিউ. সি., ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

কালের কৈশরে দেখিয়াছি যবে শুনিয়াছি কত যশ্
আমাদের দেশে নারীকুলে সব চৌ আড়ালেতে বসবাস।

নানী-দাদী, বু-মা, চাচী-ফুফু, বোন, খালা যত নারী
সদা সর্বদা চেষ্টা করিত রহিতে ঘর-বাড়ী।
ভীন পুরুষেরা দেখিত না তাদের, দেখিত আপনজন
শ্বশুর, ছেলে, স্বামী, বাপ-ভাই জানি গোনা দু'চারজন।

মেঝমান আসিলে আদর করিয়া বসাইতো কাচারী ঘরে
খানা-পিনা সব আলোচনা যত সেখানেই হইত পরে।
শিশুরা কেবল নারীদের সাথে অন্দর মহলে যাইতো
অবসর সময়ে পুরুষেরা সব কাচারিতেই কাটাইতো।

প্রভাতে জাগিয়া ফজর পড়িয়া পুরুষেরা যাইতো মাঠে
চাষের বলদ, বলদের নড়ি, লাঙল জোয়াল যাইতো সাথে।
নারীরা আগে রন্ধন করিয়া পেট মজাইতো সবার
শিশু-বৃদ্ধের যতনে খুঁজিত কাজের অবসর।

শিশুদের দল নাহি কোলাহল মক্তবে যেত দলে
ফিরে এসে ঘরে খানা খেয়ে তারা পাঠশালা যেত সকলে।
ধান, গম, পাট, ছোলা, মশুরী, জব, বতর আসিত যখন
কোমর বাঁধিয়া পুরুষের সাথে বতরে বসাইতো মন।

ঈমান-আমল বুঝি না বুঝি মসজিদে গেলে হয় পুণ্যি
জুমার দিনে মসজিদে পাইতাম নতুন ধানের সিন্নি।
নবান্নতে নতুন ধানের চিড়া-মুড়ি আর খৈ-এর খেলা
শীত আসিলেই নারীরা বসাইতো পিঠা-পায়েশের মেলা।

বসন্ত আসিলে গাছে ফুল ফুটিলে ডাকিয়া উঠিত কোকিল
আষাঢ়ে বরষায় জলে মাছে ভরিত নদী-নালা, খাল-বিল।
ছেলে-বুড়ো সব সখ করিয়া মাছ ধরিত জালে
নক্শী কাঁথা বুনিত নারীরা চিবাইত পান গালে।

মুসলমানেরা পালন করিত কালিমা-নামাজ-রোজা
অন্যায় অপরাধে ছোট-বড় সব বিচারে হইতো সোজা।
হিন্দু মানিত সরস্বতী, দুর্গা, ভগবান শিরমনি
সকাল-সন্ধ্যায় তুলসিতলায় শুনিতাম উলুধ্বনি।

এখনকার যুগে ধর্ম ভুলিয়া বেপরোয়া যত মানুষ
শিশু-বৃদ্ধা-যুবা কাহারও মনে মরিবার নাই হুস।
নারীরা চলেছে আন্দোলনে 'চাই পুরুষের সম অধিকার'
অধিকারের নামে বেগবান হয়েছে পশ্চিমা কালচার।

এদেশে আগে আশীর্বাদ ছিল ধান, তামাক আর পাট
এখনকার যুগে পোশাক শিল্প সোয়েটার, গেঞ্জি, প্যান্ট-শার্ট।
শ্রমিক-মালিক শ্রমে নিয়োজিত অধিক অথবা অল্প
ইহাদেরই জন্য আশীর্বাদ কেবল তৈরী পোশাক শিল্প।

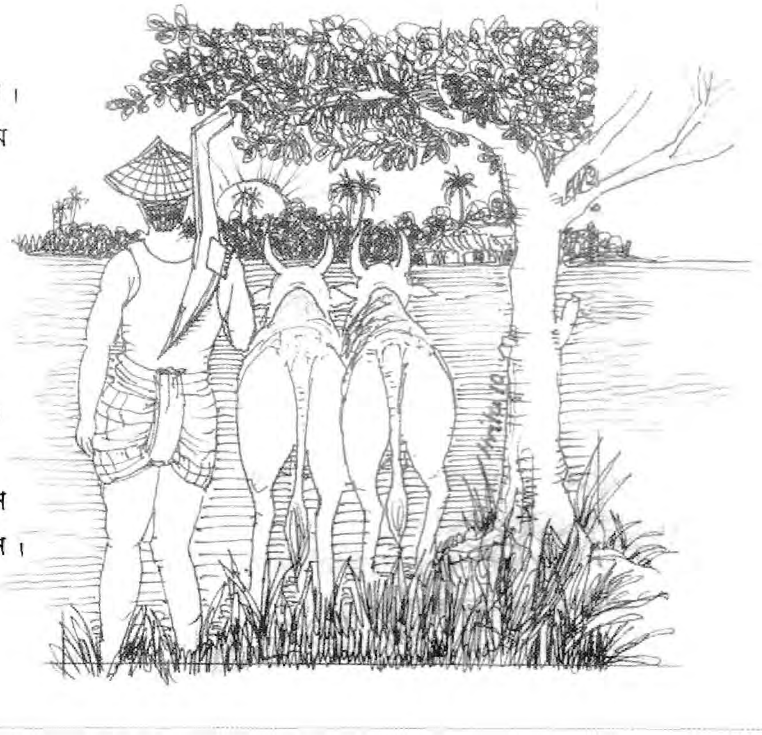

একটি মেয়ে

শিউলি আক্তার
কিউ. সি.,স্টোর, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

গাঁও গেরামের একটি মেয়ে আসলো ঢাকায় একা
কাজটা তেমন নয়তো কিছু শহরটাকে দেখা ।

চলছে মানুষ বাস রিকশায় চলছে বা কেউ রেলে
এসব কিছুই গ্রামের মেয়ে দেখছে দু'চোখ মেলে ।

দুই তলা সব গাড়িগুলো নিয়ম বাঁধা রুটে
এতোগুলো মানুষ নিয়ে কেমন করে ছুটে?

একটা জিনিস গ্রামের মেয়ে লক্ষ্য করে ভারি
কে লোকটা হাত ইশারায় দেয় থামিয়ে গাড়ি ।

পান দোকানে নাম জেনে নেয় ট্রাফিক পুলিশ উনি
কাজ কর্মে দেয় না ফাঁকি এমন মহৎ গুণী ।

গ্রামের মেয়ে ভাবতে থাকে এতো ভাল তবে
আমার ছেলে বড় হয়ে ট্রাফিক পুলিশ হবে ।

ছেলে না হয় ট্রাফিক হবে, আমি হব কি?
তাই তো আমি ব্যাবিলনের কর্মী হয়েছি ।

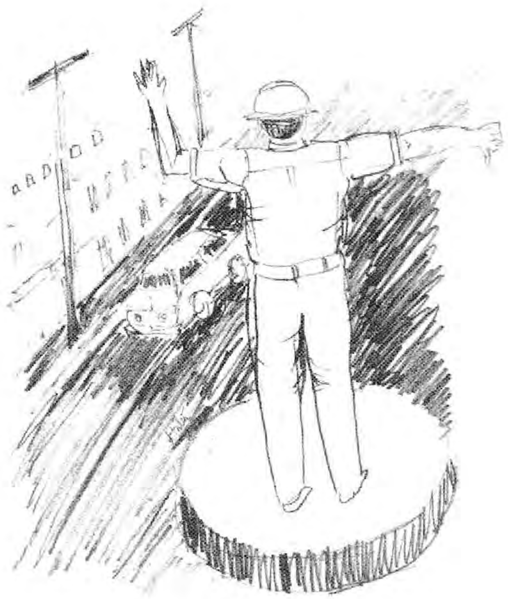

নিয়ম

রোকনুল আমীন রোকন
সুপারভাইজার, ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ

ভাল লাগলেই ভালবাসি অনায়াসে বলতে নেই,
ইচ্ছা হলেই আঁধার রাতে পাশা-পাশি চলতে নেই ।

অকষ্ট কল্পনাতে যখন তখন ভাসতে নেই,
চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে একলা রাতে হাসতে নেই ।

প্রথম প্রেম অসময়ে অপাত্রে যে দিতে নেই,
চেনা জনে মালা দিলেই কণ্ঠ পেতে নিতে নেই ।

ঝরা ফুলের পাপড়িগুলো যত্নে তুলে রাখতে নেই,
বিদায় যাকে দিতেই হবে, তার কাছেতে থাকতে নেই ।

সমুদ্রেরই তীরে এসে ঢেউ-এর ভয় করতে নেই,
স্মৃতির ডোবায় ডুব দিয়ে যে অসময়ে মরতে নেই ।

আপন করে নেবে যাকে ভুল যে তার খুঁজতে নেই,
হৃদয় দিবে যার হাতেতে তাকে ভুল বুঝতে নেই ।

আপন হতে চায় যে তোমার, তাকে দূরে ঠেলতে নেই,
হৃদয় নিয়ে নদীর মত ভাঙা-গড়া খেলতে নেই ।

চোখের নেশায় ভালবাসা, খুব ভাল নয়-মানতে হয়,
মনের কথা বুকের মাঝেই রাখতে ধরে জানতে হয় ।

কাল কেউটে

মাহবুব আল মামুন বিপ্লব

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, প্রোডাকশন, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

সন্ধ্যা ঘনায়মান। স্থানীয় হাটে ধান বিক্রি করে বাড়ী ফিরছেন এনামুল ভাই। আমার শিক্ষক। তিনি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আমরা (সহপাঠিরা) তার কাছে ইংলিশ পড়তাম। তার প্রতি যত শ্রদ্ধা তা শুধু পড়ার টেবিলেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তিনি ছিলেন বড় ভাই। আসলে বয়সের ব্যবধান খুব বেশী ছিল না, আর সে কারনেই সম্পর্কটা ছিল কিছুটা বন্ধুর মতই। ব্যাগ ভর্তি করে সপ্তাহের বাজার সেরে নিয়েছেন। বাজার হতে তিন মাইলের কিছু বেশী উত্তরে তার বাড়ী। মেঠো পথ ধরে মাইল দুই চলার পর চরাচর জুড়ে নেমে এল ঘন অন্ধকার।

রাতের পথ ধরে বাজার থেকে বাড়ীতে যাওয়া তার জন্য নতুন কিছু নয়। এ জীবনে এই একই পথ ধরে কতবার বাড়ী ফিরেছেন তার হিসাব নেই। তারার আলোয় ভর করে মাঝের দুটো গ্রাম পেরিয়ে পা রাখলেন নিজ গাঁয়ের সীমানায়।

মেঠো পথ থেকে এবার তিনি এগিয়ে চললেন ধান ক্ষেতের আল ধরে। আলের উপর দিয়ে হাটতে গিয়ে হঠাৎ তিনি পায়ের গোড়ালির কাছে সুই ফোঁটার মত সামান্য ব্যথা অনুভব করলেন। হাতের ব্যাগ আলের উপর রেখে দিয়াশলাই বের করে আলো জ্বালালেন তিনি। গোড়ালির চামড়ায় সূক্ষ্ম দুটো ক্ষত দেখা গেল, সেগুলো থেকে চিকন ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সাহসী যুবক তাই ক্ষত বা রক্ত দেখে না ঘাবড়ে তিনি আরও কয়েকটা দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আলের চারপাশ ভাল করে দেখে নিলেন। না, তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। তিনি ধরে নিলেন অসাবধানে হাঁটতে গিয়ে তার পা পড়েছিল মেঠো ইঁদুরের দেহে, আর তাতেই এই বিপত্তি। বিষাক্ত সাপের ছোবলের কথা একবারও তার মাথায় এলো না। কারণ সাপের ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত স্থানে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। অথচ তার পায়ে বলতে গেলে বিন্দু মাত্র ব্যথা নেই। তাই তিনি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীতে চলে এলেন।

উঠানে পা দিয়েই তিনি রসিক গলায় ডেকে উঠলেন, 'কই গো আমার নতুন বউ, দেখো তোমার জন্য কত বাজার নিয়ে এসেছি'।

মৃদু পায়ে বেরিয়ে এলেন নব বধু, বিয়ে হয়েছে ৩ মাসও হয়নি। তাই এখনো ফরিদার (নামটা পরে জেনেছি) জড়তা কাটেনি। স্বামীর হাত থেকে বাজারের ব্যাগ নিয়ে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন ফরিদা। তখন এনামুল ভাই বললেন, 'রান্নাঘর থেকে একটু কালি নিয়ে এসো, মনে হয় পায়ে ইঁদুরে কামড় দিয়েছে'।

গ্রামাঞ্চলে অনেকেই হাত-পা কেটে গেলে ঔষধ হিসেবে রান্নাঘরের বেড়ায় বা চালে জমে থাকা কালি বা ছাই ব্যবহার করে থাকে।

স্বামীর কথা শুনে অজানা শঙ্কায় কেঁপে ওঠে ফরিদার মন। এক চিমটি কালি হাতে তিনি দ্রুত ছুটে আসেন স্বামীর পাশে। কুপির আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ক্ষত দুটো থেকে এখনও চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। ফরিদা তখন আঁতকে উঠে বললেন,

– 'ইঁদুরে কামড় দিয়েছে নাকি সাপে সেটা আপনি কেমন করে বুঝলেন? তাড়াতাড়ি পা বেঁধে ফেলেন। এক্ষণি ওঝাকে খবর দিতে হবে'।

বউয়ের কথায় এনামুল ভাই বলেন, 'এটা যদি সাপ হত তাহলে আর বাড়ী পর্যন্ত আসতে হত না, এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতাম ধান ক্ষেতের আইলে'।

স্বামীর এ কথায় স্বস্তি ফিরে আসে ফরিদার মনে। তিনি যত্ন করে কালির আস্তরণ লাগিয়ে দেন ক্ষতস্থানে।

তখন গভীর রাত। কিন্তু এনামুলের চোখে ঘুম নেই। বিশেষ এক অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে চলেছে। শত চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। নানা চিন্তা এসে জড় হল মনে। বিয়ের প্রথম দিকে মাঝে মধ্যে সবারই কি এমন হয়! একি অতৃপ্ত কামনার অজানা বহিঃপ্রকাশ!

অস্থিরতা তাকে উন্মাদ করে তুলতে চায়, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। তারপর একসময় অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল। পেটের মধ্যে চিন চিন ব্যথা শুরু হল তার এবং আস্তে আস্তে তা তীব্র ব্যথায় রূপ নিল। সেই সাথে শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ায় জোড়ায় প্রচন্ড ব্যথায় যেন ফেটে পড়তে চাইল। নিদারুন ব্যথায়, যন্ত্রণায় তিনি ফরিদাকে ঘুম

থেকে ডেকে তোলেন। ব্যথার কথা জানাতেই ফরিদা প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠেন,

– 'আমি আগেই বলেছিলাম, এটা সাপের কামড় হতে পারে। আপনি আমার কথা শুনলেন না'। এরপর রশি দিয়ে স্বামীর গোড়ালির উপর শক্ত বাঁধন এটে দেন তিনি।

শরীরের সমস্ত গাঁট আর পেটের ব্যথায় ছটফট করে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়তে শুরু করে তার দেহ। তখন বউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইলেন তিনি, কিন্তু জিব বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সঙ্গে। কথার বদলে মুখের একপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তরল লালাস্রোত।

স্বামীর যন্ত্রণাকাতর অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন ফরিদা। তার গগন বিদারী চিৎকারে ছুটে আসে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন। তখন চোখের দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে এনামুল ভাইয়ের, ভারী হয়ে উঠেছে চোখের পাতা। কিছুক্ষণ আগে অনেক চেষ্টা করেও এদের এক করতে পারেননি, আর এখন প্রাণপণ ইচ্ছা করেও চোখ মেলে রাখতে পারছেন না। ক্রমাগত বুজে আসা চোখের পাতা এক সময় পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হল প্রবল শ্বাসকষ্ট আর বমি।

শেষ রাতের দিকে নিয়ে আসা হল আলতাফ ওঝাকে। রোগীর সমস্ত শরীর তখন বরফের মত ঠান্ডা, ক্ষতস্থান ফুলে ঢোল হয়ে আছে। সেই সূক্ষ্ম ক্ষত দুটো স্ফীত হয়ে প্রায় এক স্থানে মিশে ঘায়ের রূপ নিয়েছে।

অভিজ্ঞ ওঝা এক নজর দেখেই বুঝলেন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এ রোগীকে বাঁচানো মুশকিল। তবুও চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। ক্ষতস্থান তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে শিঙ্গার সাহায্যে বিষাক্ত রক্ত বের করতে লাগলেন। সেই সাথে কাকে উদ্দেশ্য করে বিরামহীন ভাবে নানা রকম মন্ত্র আওড়ে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এক সময় রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে ওঝা সবাইকে আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি আসলে বুঝতে পেরেছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে।

ওঝা চলে যাওয়ার পরপরই প্রচন্ড খিঁচুনি শুরু হলো দেহে। থেমে থেমে তা চলার পর এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেল দেহ। সবাই ধরে নিলেন আসলে নিস্তেজ নয়, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন এনামুল। কিন্তু ফরিদা তা মানতে নারাজ। স্বামীর বুকের মধ্যে কান পেতে চিৎকার করে বললেন,

– 'বুকের মধ্যে ধড়ফড় আওয়াজ আছে, আপনারা এক্ষণি হাসপাতালে নেন'।

গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও বিশ্বাস করে সাপে কাটা রোগীর দেহে আত্মা চাপা অবস্থায় বিরাজ করে। আপাতত দংশিত মানুষকে মৃত মনে হলেও মৃত নয়। তারপর তার নিথর দেহ ভ্যান গাড়িতে তুলে হাসাপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিল একদল মানুষ।

জেলা সদর হাসপাতালে পৌঁছতে ঘন্টা দুয়েকের বেশী লেগে গেল। কর্তব্যরত ডাক্তার দেহ পরীক্ষা করে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'হি ইজ স্টোন ডেড। কম করে হলেও ঘন্টা তিনেক আগে মৃত্যু হয়েছে'। তারপর লাশ ফিরিয়ে আনা হল বাড়ীতে।

– 'এটা কাল কেউটের কাজ,' আলতাফ ওঝা তার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন। সাধারণের থেকে বেশী অভিজ্ঞ হওয়ায় আপাতত তার কথা মেনে না নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

***

ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকায় একদা ভারতে অধ্যয়নরত বাল্যবন্ধু শংকরের মাধ্যমে একটি বই সংগ্রহ করেছিলাম আমি, যাতে বিভিন্ন প্রকার সাপের আচরণগত দিক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বইটি আমার ছাত্রাবাসের রুম থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বইটি মনযোগ দিয়ে পড়েছিলাম, স্মৃতি থেকে কালকেউটে সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি – একটি পূর্ণ বয়স্ক কালকেউটে সর্বোচ্চ পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এদের গায়ের রং কালচে। গলার কাছ থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত জোড়ায় জোড়ায় ভেসে থাকা বলয়সমূহ এদের কালো শরীরে ভয়ংকর প্রতিমূর্তির মত ফুটে থাকে। মাথার তুলনায় এদের ঘাড় বেশ মোটা। এর প্রিয় খাবার হল অন্য সাপ। বিষধর, অবিষধর দু'ধরনের সাপই এরা ভক্ষণ করে থাকে। কালকেউটে রহস্যময় সাপ, মানুষ আজও এদের সম্পর্কে তিমিরেই রয়ে গেছে। তাই বিষধর সাপ বলতে একমাত্র গোখরোকেই জানে। গোখরো মেজাজী সাপ। দীর্ঘ দেহ, প্রসারিত ফনা, ভয়ংকর ফোঁস ফোঁস শব্দ–সব কিছু মিলিয়ে সহজে এদের অস্তিত্ব মানুষের চোখে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু দ্রুত ছোবলে পারদর্শী, নিভৃতচারী, নিশাচর কালকেউটের অস্তিত্ব মানুষের কাছে যথেষ্ট অজানা, অথচ এদের কারণেই মানুষ বেশী মারা যায়, আর দোষ গিয়ে পড়ে বেচারা গোখরোর ঘাড়ে। তাই দেখা মাত্রই মানুষ এদের হত্যা করে থাকে। বিষয়টি সেই গ্রাম্য প্রবাদের মত– চোরায় চুরি করে, অচোরায় পইড়া মরে।

পদ্ম

ডাঃ জান্নাতুন নাহার
মেডিক্যাল অফিসার, ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস

'পদ্ম, তুমি হয়তোবা জলে ভাসা পদ্ম হয়ে
এই পৃথিবীতে এসেছিলে,
কিন্তু আমার বিশ্বাস একদিন কেউ নিশ্চয়ই
তোমাকে "পদ্মা, পদ্মাবতী" নামে ডাকবে' ।

*** *** ***

– 'এই রোগীটা এখনও এখানে কেন'? বেগম ম্যাডামের এই একটা কথায় বজ্রাহত হলাম আমি। 'গতকাল বলেছি ছেড়ে দিতে, আজ পর্যন্ত এখানেই আছে, আমার কথা কি কেউ শুনতে পাচ্ছে না?... ...' বলেই চলেন ম্যাডাম । আর সবাই বিরক্তিভরে তাকায় আমার দিকে । কারণ এইসব কিছুর জন্য আমিই দায়ী । অথচ ভুগতে হচ্ছে ইউনিটের সবাইকে ।

ঘটনাটা ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসের। আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গাইনী ওয়ার্ডে ইন্টার্নীরত। যার জন্য এই অনাসৃষ্টি সে সদ্য যমজ সন্তানের জন্মদাত্রী রুগ্ন, ক্লান্ত একজন মা । বাড়ীতে প্রথম মৃত সন্তান প্রসব করার পরে হাসপাতালে এসে তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়, জীবিত । আর এই জীবিত সন্তানই তার এই দুর্গতির কারণ । আশে-পাশে সবার কাছে তার বিনীত আকুতি –

– 'টেয়া লাগতয়না, আমার ফুরিটারে কেউ লনগি । দয়া করয়ইন, আমারে দয়া করয়ইন' (টাকা লাগবেনা । কেউ আমার এই কন্যাকে দত্তক নিয়ে আমাকে দয়া করুন) ।

তার এই আহাজারি কাউকে স্পর্শ করছিল না । বরং সবাই তাকে এমনভাবে গা বাঁচিয়ে চলছিল যেন অস্পৃশ্য কোন আবর্জনা । আর তার প্রতি সবার এই নির্দয়তার কারণ – সে একজন পতিতা, সমাজের চোখে সবচেয়ে ঘৃণ্য পেশার কর্মী । অবশ্য আমার কাছে সে ছিল শুধুই একজন "হতভাগ্য মা" । যিনি যে কোন মূল্যে নিজের কন্যাকে এই ঘৃণ্য পেশা থেকে দুরে রাখার জন্য অন্যের দয়ার এত কাঙ্গাল ।

নিজের আত্মীয় বলতে তার কেউ ছিল না, সমাজ তাকে পরিত্যাগ করেছে বহু আগেই। গর্ভবতী হওয়ায় নিজের একমাত্র উপার্জনের পথও বন্ধ । একটা ওষুধ কেনার মত টাকাও ছিল না তার কাছে। একজন ইন্টার্নী ডাক্তার হিসেবে ওষুধ ও পথ্য যোগাড় করার যথেষ্ট যোগ্যতা আমার থাকলেও নিজের হাতে যে শিশুকে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে এসেছি, তাকে এই পৃথিবীতে সুস্থ, স্বাভাবিক কোন পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার কোন ক্ষমতাই আমার ছিল না। যতবার ঐ শিশুর দিকে তাকাচ্ছিলাম ততবার লজ্জায়, শঙ্কোচে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম । যে সমাজ একজন মানুষকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে দিতে পারে না, সেই সমাজ কিভাবে তাকে সমাজচ্যুত করতে পারে? ঘৃণা করতে পারে?

শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে ওয়ার্ডের এক আয়ার সহায়তায় এক নিঃসন্তান দম্পতির খোঁজ পেলাম। যারা পতিতার সন্তান জানা সত্ত্বেও আনন্দে পদ্মকে (আমার দেয়া নাম) দত্তক নিল । তাদের কাছে পদ্মর দায়ীত্ব দিয়ে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম । আর মনে করলাম, একজন নারীকে হয়তোবা পতিতাবৃত্তির মত জঘন্য অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারলাম । সৃষ্টিকর্তার কাছে নত হয়ে স্বীকার করলাম –

"আমারে তুমি অশেষ করেছো এমনই লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার দিয়েছো জীবন নব নব"

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও নাটকীয়তায় ভরা একটি শিপমেন্ট

মুহাম্মদ সাইফুল হক
ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং, ওভেন টপ্‌স এন্ড বটম

আজ ২০ জুলাই। এ পর্যন্ত ব্যাবিলন কথকতার জন্য কোন লেখা তৈরী করতে পারিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের একটি ফোন কল আমাকে প্ররোচিত করল ব্যাবিলন কথকতার জন্য কলটির নেপথ্য বর্ণনা করতে।

মার্চের প্রথম দিকে ৬০ হাজার পিসের একটি সার্টের অর্ডারের প্রস্তাব এল। যাতে দুটি স্টাইল আছে – বড় ভল্যুয়্যুমটি অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু ছোটটি বেশ জটিল। কাঙ্খিত ডেলিভারির জন্য স্পেস না থাকায় না করে দিলাম। কিন্তু না বললেই কি আর সবাই তা মানতে চায়? আর বিশেষ করে তিনি যদি কোরিয়ান হন তাহলে তো কথাই নেই। তবে তিনি সাধারণ কোরিয়ানদের চেয়ে আলাদা। এমন চমৎকার ব্যক্তিত্ব, সহজে মেশার ক্ষমতা ও আপন করার দক্ষতা খুব কম মানুষেরই আছে। তার সাথে আমরা কাজ করি ২০০৩ থেকে। তিনি আমেরিকান একটি বড় কোম্পানির ঢাকা অফিসের প্রধান। গতবার হঠাৎ করেই কোম্পানিটা বিক্রি হয়ে যায়। তারপর তিনি এবং তার কয়েকজন সহকর্মী মিলে নতুন অফিস চালু করেন। এ অফিসকে সহযোগিতা করা আমাদের একটি অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে ছিল। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমরা না করতে পারিনি। যদিও প্রস্তাবিত আমেরিকার অর্ডারটির জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরির বাইরে উৎপাদন সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের স্পেস সমস্যার কারণে তারা যে কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করার অনুমোদন দেয়ায় আমরা শেষ পর্যন্ত অর্ডারটি গ্রহণে রাজী হই। গত বছরের মাঝামাঝি থেকে অর্ডার ক্রাইসিস ফেস করার কারণে আমাদের মার্কেটিং ও মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত তৎপর ছিল অর্ডার সংগ্রহ করতে। যার ফল হল – আমরা এ বছর প্রথম থেকেই বেশ কয়েকটি বড় রিটেইলার-এর অর্ডারের আশ্বাস পাই। একটা সময় মনে হল আমরা যদি কিছু ক্রেতাকে রিগ্রেট না করি তাহলে আমাদের অতি অর্ডারে বিপর্যয় হতে পারে। যা হোক কিছু ক্রেতাকে আমাদের নাখোশ করতে হল। প্রচন্ড চাপ নিয়ে শিপমেন্ট করতে থাকলাম এ বছরের জানুয়ারী থেকেই। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে এ চাপ ক্রমশ বাড়লেও এপ্রিলে অপেক্ষাকৃত কম চাপ থাকায় কোরিয়ান ক্রেতাকে বলেছিলাম– 'যদি মিড এপ্রিলে কাঁচামাল দিতে পারেন তাহলে ভালভাবে শিপমেন্ট দিতে পারব। কারণ মে, জুন ও জুলাইতেও রয়েছে অতিরিক্ত চাপ।'
তিনি বললেন– 'কাঁচামাল দেব ২০ মে।' কাজেই আমার প্রস্তাব কোন কাজে লাগল না। যাহোক ডেলিভারি নির্ধারিত হলো ৩০ জুন। এপ্রিলে তুলনামূলক কাজের চাপ কম ছিল উপরন্তু কিছু কাস্টমারের অর্ডারের টাইম এন্ড অ্যাকশন ফেইল করায় আমরা হঠাৎ করে অর্ডার ক্রাইসিসের মুখোমুখি হলাম। সাব-কন্ট্রাক্ট করে এপ্রিলে সেই শূন্যতা দুর করলেও ভাবনাতীত হয়ে দাড়াল মে ও জুনের ডেলিভারিগুলো পিছিয়ে যাওয়া অর্ডারের অতিরিক্ত চাপে। অতিরিক্ত চাপ শুরু হয়ে গেল মে মাসের মাঝামাঝি থেকে। আমাদের সবগুলো প্রডাকশন লাইন বুক হয়ে গেল দীর্ঘ সময়ের জন্য। যে সকল ক্রেতার কাঁচামালের টাইম এন্ড অ্যাকশন ফেইল করেছে আমরা তাদের বলতে থাকলাম গার্মেন্টস ডেলিভারির সময় বর্ধনের জন্য। অনেকে সহজে মেনে নিলেও আমাদের প্রিয় ব্যক্তিটি মানতে চাইলেন না। যদিও তিনি তার কমিটমেন্ট থেকে ২০ দিন পরে কাঁচামাল ডেলিভারি দিয়েছেন। বরং তিনি নানাভাবে চাপাচাপি করতে থাকলেন। যেভাবেই হোক ২০ দিনের এই দেরীকে আমাদের মেক-আপ করতে বললেন অতিরিক্ত প্রোডাকশন লাইন দিয়ে বা অন্য কোন প্রোডাকশন ইউনিট ব্যবহার করে। এর মধ্যে তিনি আমদের মার্কেটিং ডিরেক্টরকেও বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন তাকে সাহায্য করার জন্য। ঘটনাগুলো বিশেষভাবে ঘটতে শুরু হল মে মাসের শেষ থেকে। তখনও কাঁচামাল আসেনি, তা আসতে পারে ১০ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ ২০ দিনের মধ্যে শিপমেন্ট করতে হবে প্রায় ৬০ হাজার অত্যন্ত জটিল কাপড়ের শার্টের অর্ডার। তিনি আমাদের প্ল্যান করতে বললেন জুনের শেষে ডেলিভারি মিট করিয়ে দেয়ার জন্য। আমরা বললাম আমাদের সকল লাইন এখন বুকড্ এবং কোনভাবেই তা জুন শেষ-এর আগে ফ্রি হবে না। যেহেতু আপনি ২০ দিন পরে আপনার কাঁচামাল দিয়েছেন কাজেই গার্মেন্টস ডেলিভারির তারিখ হতে হবে ২০/২১ জুলাইয়ের দিকে। তিনি মানতে রাজি হলেন না এবং আমাদের জুন শেষে ডেলিভারী দিতে চাপাচাপি করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের ডিরেক্টর মার্কেটিং মধ্যস্থতা করে প্রডাকশন প্ল্যানারকে বললেন– 'অন্য অর্ডারকে ক্ষতি করিয়ে হলেও তাদের অর্ডারকে গুরুত্ব দিন'। ঠিক হল আমরা একটি প্রডাকশন লাইনকে ১৫ জুন থেকে দেব এবং তারা কিছু অংশ অন্য একটি ফ্যাক্টরিতে করিয়ে নেবেন।

শুরু হল নাটকীয়তা। কিছুদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারলেন তারা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যে ফ্যাক্টরির ভরসায় তারা বাকী কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন সেই ফ্যাক্টরি অনেক বড় হলেও কাজে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই অবনত মস্তকে আমাদের বিকল্প ফ্যাক্টরি খুঁজতে বললেন। এবার আমাদের পালা। একটি কারখানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথা দিলেন তারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। মজুরি যা না তাই চাইলেন। আমরা বড় ক্ষতি থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতি মেনে নিলাম। কিন্তু দুদিন পরেই সেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইউটার্ন নিলেন এবং অর্ডারটা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাঁকে তাঁর কমিটমেন্টে ফেরানো গেল না তখন বিষয়টা খুব রহস্যজনক মনে হল আমাদের মার্কেটিং ডিরেক্টরের কাছে। তিনি নিজেই কথা বললেন তার সাথে। ভদ্রলোকের ভাষায় আঞ্চলিকতা থাকায় কথোপকথন কৌতুককর মনে হলেও অবস্থার পরিবর্তন হল না। কিন্তু আবার নাটকীয়তা। হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক ফোন দিলেন আমার Director -এর সাথে কথা বলার জন্য। অফিস সময় পার হওয়াতে তিনি তখন বাসায় বলাতে তিনি বাসার নম্বর নিলেন। আমাকে খুলে না বললেও বুঝতে বাকী রইল না তিনি আবার মত পাল্টেছেন। যাহোক ইঙ্গিত শুভ দেখে তৎক্ষণাৎ ফোন দিয়ে আমি Director স্যারকে অনুরোধ করলাম তাঁকে ফোন করার জন্য। আবার আশায় বুক বাঁধলাম কিন্তু আরও যে নাটকীয়তা অপেক্ষা করছিল তা মালুম করতে পারিনি। দুদিন পরেই জানতে পারলাম তিনি আসলে Paid Director ছিলেন এবং তার ভাগিনা যিনি সত্যিকারের মালিক তিনি তাকে অব্যহতি দিয়েছেন। টেনশন মাথায় নিয়ে নতুন করে যোগাযোগ শুরু করতে হল তরুণ পরিচালক ও GM Production - এর সাথে। তাদের উৎসাহ দেখে আমরা সাহস পেলেও আমাদের Management বার বার সতর্ক করলেন সাবধানে অগ্রসর হতে।

আমাদের নির্বাচিত ফ্যাক্টরির সপ্তাহ দুয়েকের নাটকীয় সময়টিতে প্রিয় কোরিয়ান ক্রেতা কম তিরষ্কার করেননি আমাদের অপারগতাকে কটাক্ষ করে। তবে আমরা কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের নির্বাচিত সেই ফ্যাক্টরির আচরণকে মনে করিয়ে দিতে পারিনি। যাহোক এবার প্রডাকশন ইউনিট চূড়ান্ত হলেও target ডেলিভারি meet হয় না। কি করা - সেক্ষেত্রে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন প্রিয় কোরিয়ানের স্বদেশী ও সহকর্মীবৃন্দ। তারা কমান্ডার আর আমরা সোলজার।

তারা বললেন- 'দুটো স্টাইলের বড়টা যেটা অপেক্ষাকৃত সহজও বটে সেটা আপনারা দ্রুত শেষ করে ফেলুন আর যেটা কঠিন কিন্তু পরিমানে কম সেটা আপাতত নির্বাচিত ফ্যাক্টরিতে দিন।' যথা আজ্ঞা। আমরা তাই করলাম। কদিন পর্যবেক্ষণের পর বললেন- 'না-না হচ্ছে না। আর একটি লাইনে কঠিনটি শুরু করুন ও সহজটার কিছু কোয়ানটিটি ওদের দিন।' অনেক ঝামেলার পর তাই হল। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংশোধন ও তা পরিবর্তন করতে করতে প্রডাকশন না আগালেও দিন গড়িয়ে তা সীমান্তে চলে এল। এবার শুরু হল নতুন খেলা। ডেলিভারি ডেট এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দেয়া হল অসম্ভব এক টার্গেট। আর তা বাস্তবায়নে সকাল, বিকাল, দুপুর ও রাত চলতে থাকল মিটিং, ফলো-আপ, হিসাব, ফোন ইত্যাদি। না, হলো না - সপ্তাহ শেষ। সপ্তাহ শেষে দেখা গেল আমরা অপেক্ষাকৃত সহজ style-টির বড় একটি অংশ করলেও আমাদের সহকারী ফ্যাক্টরিটি তখনও কোন সম্ভাবনা দেখাতে পারল না। কোরিয়ান ক্রেতা আবারও বিরক্ত। পুরো ঘটনাটায় তারা যুক্ত থাকলেও দোষারোপ করলেন আমাদের। যাহোক এবার তারা আরও একটি সপ্তাহ বাড়িয়ে দিলেন। যদিও আমরা জানি এতেও কোন সফলতা আসবে না। যাহোক আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম অন্তত: একটি স্টাইলকে এয়ার শিপমেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে অপর স্টাইলটির যতটুকু পারা যায় তা জুলাইয়ের ২য় সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে।

কিন্তু মাথায় যেন বাজ পড়ল, তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মূল ক্রেতার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্ট যখন বললেন দুটো স্টাইলকেই এক সাথে দিতে হবে তা না হলে শিপমেন্ট হবে না। চলতে থাকল মিটিং, যুক্ত হল ক্রেতা প্রতিনিধির চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং আরও অনেকে। আমাদের অনুরোধ Part Shipment, তারা বললেন Full Shipment। যাহোক ২য় সপ্তাহের এক্সটেনশনও প্রায় শেষ হয়ে গেল। সবাই বুঝলেন এ কিছুতেই সম্ভব নয়। এবার ক্রেতা প্রতিনিধিরা দিতে থাকলেন এক এক দিনের টার্গেট। না হচ্ছে না। অতিরিক্ত লোক, অতিরিক্ত সময় - সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হওয়ায় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন যেন একটি আশার সঞ্চার করলো ১৯ জুলাই পর্যন্ত এক্সটেনশন দেয়ায়। এবং যা ready হবে তাই শিপমেন্ট হবে ঘোষণা দেয়ায়।

সর্ব শক্তি প্রয়োগে চলতে থাকল প্রচেষ্টা। কোরিয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগল তাদের নিরন্তর চেষ্টার ক্ষমতা দেখে। একদিন দেখি আমার প্রিয় কোরিয়ান ব্যক্তিটি যেন এখুনি হেলে পড়বেন, চোখ লাল হয়ে গেছে, ভীষণ কাশছেন, কণ্ঠস্বর খুবই ক্ষীণ।

বললাম- 'স্যার, আপনি এ অবস্থায় মুভ করছেন কেন?'

তিনি বললেন, 'তোমার সাথে কথা সেরেই ডাক্তারের কাছে যাব।'

যা হোক কেবল চেষ্টা করলেই যে হয় না ব্যবস্থাপনাও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বুঝলাম ১৯ জুলাই যখন আমরা ইন্সপেকশন অফার করলাম। আমাদের উপর চাপা-চাপি করতে করতে তারা তাদের মূল ক্রেতার ইন্সপেকশন প্রতিনিধিদের সাথে যথেষ্ট দুরত্ব তৈরী করে ফেলেছেন এবং উৎপাদন পরিকল্পনাটি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। যা সৃষ্টি করল নতুন একটি অচলাবস্থা।

এখানেও নাটকীয়তা। এবার তাঁরা আমাদের সাথে নিয়ে রীতিমত মনে রাখার মত উপায়ে অনেকটা যেন বাধ্য করলেন আমাদের তৈরী পণ্য পরিদর্শনে। যাহোক শেষ পর্যন্ত ready goods ইন্সপেকশন হল এবং তা পাশও করল। তবে আমাদের টিমের বেশ কয়েকজনকে সারা রাতব্যাপী কাজ করতে হল কার্টন স্টিকারের একটি সমস্যা সমাধানের জন্য। এতে সেই প্রিয় কোরিয়ান ব্যক্তিটিও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়েই ছিলেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে যখন এই পর্যায়ে আসল আমি একটি SMS পেলাম- Goods started for Chittagong. একটি পরিতৃপ্তির হাসি হাসলাম এবং সৃষ্টি কর্তাকে কৃতজ্ঞতাও জানালাম।

ঘটনাটি এ পর্যন্ত থাকলে আজ আমার কলমে লেখা হয়ে তা আসত না। কেননা এতো হর হামেশাই হয়। যে কারণে গল্পটি লিখলাম তা হল সকাল আটটায় একটি কল পেলাম প্রিয় কোরিয়ানের এক সহকর্মীর কাছ থেকে। তিনি জানালেন ২ হাজার পিসের ছোট যে PO দুটো আছে তা চট্টগ্রাম যাবে আর বড় PO যাতে প্রায় ৪৩ হাজার পিস আছে সে ট্রাকটি ঢাকায় ফেরত আনতে হবে এয়ার শিপমেন্ট-এর জন্য। আমি 'এয়ার শিপমেন্ট' কথাটি শোনার সাথে সাথে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললাম। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অস্ফুট স্বরে জানতে চাইলাম-

-'কেন'?

তিনি কেবল বললেন, 'ক্রেতা প্রতিনিধিই এই এয়ার শিপমেন্টের-এর খরচ বহন করবে'।

কথা আর না বাড়িয়ে মেইল দিতে অনুরোধ করলাম। ফোন শেষে জানলাম গাড়ী এসেছে আমাকে অফিসে নিতে। গাড়ীতে উঠেই লিখতে শুরু করলাম। কারণ পেশা জীবনে এর চেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি আমি হইনি। তবে অন্য কেউ যে হননি তা কিভাবে যাচাই হবে আমি যদি তা 'ব্যাবিলন কথকতা' কে না জানাই!

পুনশ্চঃ

আরও রহস্য রয়েছে তা জানতে হলে যোগাযোগ করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে।

ড. কদম আলীর চাষাবাদ

শামীমুল ইসলাম
ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন্স

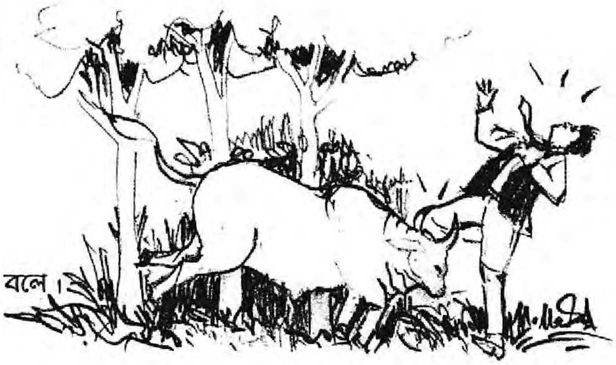

-কি শুকুর আলী, শুনলাম, তোমার ছাওয়াল মস্ত বড় পাশ দেছে।
-ঠিকই শুনেছো। শিক্ষিত লোকের পোলা বড় পাশই তো দেবে।
কথায় আছে না যেমন বীজ তেমন ফলন।
-তা যা কইছো। তা ছাওয়াল কি পাশ দিলো?
-সয়েল সাইন্সে পিএইচডি করেছে।
- তা সল সাইন মানে কি শুকুর আলী?
-এটা হলো মাটি বিজ্ঞান। যেটাকে বইয়ের ভাষায় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বলে।
তুমি অশিক্ষিত মানুষ, এ সব ঠিকমত বুঝতি পারবানা।
-আচ্ছা। তালি কদম, মানে তোমার ছাওয়াল এখন কি করবি?
-ছাওয়াল কি করবে ছাওয়ালই ঠিক করবে। কথা হচ্ছে ছাওয়াল লাইনমত এগোয়ে যাচ্ছে।
-লাইন বলে কথা। তোমার ছাওয়ালের সাথে বিদ্যাবিথী স্কুলে যে ফাস্ট হতো, সেই করিম মাস্টারের ছাওয়াল আরিফ কিন্তু বে-লাইন হয়ে গেছে। শুনলাম সে নাকি কোনমতে লেখাপড়া শেষ করিছে।
-করিম মাস্টাররা বড়লোক হতি পারে, কিন্তু ভদ্রলোক হতি পারবে না। পাঁচ পুরুষ ধরে লেখাপড়া করতিছে, দেশ-বিদেশে থাকে। আবার উঠাবসা চাষাভূষাদের সাথে, সমাজ-রাজনীতি করে বেড়ায়। দিন পাল্টেছে। এখন ছোটলোকেরা আর মানি লোকের সম্মান দেয় না। তাই তোমার সম্মান তোমাকেই রক্ষা করতে হবে। কথাগুলো একটানে বলে গেলো শুকুর আলী।

ত্রিমাথায় চলে আসায় চা খাবার জন্য শুকুর আলী বাজারের পথ ধরে। আর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় মবিন জর্দার বাড়ির পথ। এতক্ষণ মবিন জর্দার যে ভঙ্গিতে কথা বলছিল, যাবার সময় মুখটা একটু ভারী হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে থাকে মবিন জর্দার। বয়সের ভারে নয় যত, তার থেকে মনের ভার বেশি মবিন জর্দারের। মবিন জর্দার দম্পতির কোন সন্তান নেই।

মনে মনে পুলকিত ভাব নিয়ে আব্দুলের চায়ের দোকানে আসে শুকুর আলী। আলোচনা চলছে। তাতে মানুষের ক্ষোভের আঁচ পাওয়া যায়। 'সার পাওয়া যাচ্ছে না'। শুকুর আলীর উপস্থিতি সে আলোচনায় কোন প্রভাব ফেলে না।

-আব্দুল এক কাপ চা। শুকুর আলী চায়ের অর্ডার দেয়।
-কি শুকুর আলী একা একা চা খাবা। ছাওয়াল তোমার আমেরিকায় পিএইচডি করেছে। সবাইকে চা খাওয়াও। করিম মাস্টারের ছোট ভাই দবির বলে গলা উচিয়ে।
-হ্যা হ্যা। সবাই সায় দেয় দবিরের কথায়। চায়ে চুমুকের সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দ ওঠে।
-কদমের সাথেই পড়তো করিম মাস্টারের ছাওয়াল আরিফ। তার কি খবর? কেউ একজন প্রশ্ন করে হাওয়ায়।
-ওর রেজাল্ট ভাল না। রাজনীতি করে বেড়ায়। সংক্ষুব্ধ উত্তর দবিরের।
-শোনো। আমার কদম আসতেছে। কদমের মা একটু আমোদ আহ্লাদ করতি চায়।
-হ্যা শুকুর তোমার ছাওয়াল যে একটা রত্ন তা মানুষগেরে জানানো দরকার। তাতে নতুন প্রজন্ম উৎসাহ পাবে। খন্‌খনে গলায় বলে কেরামত মাতবর।

কেরামত মাতবরের কথায় পরিবেশ যখন গরম হয়ে উঠছে, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে আসতে থাকে বকুলতলা বাজারে। এক এক করে চায়ের আসর থেকে উঠে যেতে থাকে মানুষ। এক সময় শুধুই কেরামত মাতবর আর শুকুর আলী থেকে যায় আব্দুলের চায়ের দোকানে। আব্দুলও দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি শুরু করে। ও দিকে দু'জনের সরব আলাপ ফিশফিশানীতে নেমে আসে।
-এমন সুযোগ আর পাবা না শুকুর আলী। জ্ঞানে আমরা যে এখন কাজীদের ওপরে, এটা জানান দেয়ার সময় হইছে। শুকুর

আলীর দুঃসম্পর্কের চাচা কেরামত মাতবরের আত্মাভিমান প্রকাশ পায়।

-হ্যা চাচা ঠিকই কইছেন। এই একবিংশ শতাব্দীতে আ'সে মান্ধাতার আমলের চিন্তা-ভাবনা আর ভাষা দিয়ে চলবিনে। চিন্তা চেতনায় আধুনিক হতি হবি। একটা অভিসন্দর্ভের ভূমিকা দেয়ার মত করে এটুকু বলার পর শুকুর আলী যোগ করে-

-আমার ছাওয়াল যা সুদ্দু ভাষায় কথা কয় না, আপনি শুনলেও অবাক হবেন চাচা।

-জ্ঞান যে আমাদেরও হইছে তা কাজীদের একটু বোঝানো দারকার।

-কেরামত চাচা কাজীরাতো আপনাদের নিয়ে মাতামাতি করে না---

-দেখ্ আব্দুল কথার মধ্যে নাক ঢুকাস নে। যা বুঝিসনে তা নিয়ে কথা বলতে আসিসনে। আব্দুলকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় কেরামত মাতবর।

শুকুর আলীর ছেলে কদম মাস্টার্সেও ভাল রেজাল্ট করেছিল। পরে পিএইচডি করতে পাড়ি জমায় মার্কিন মুলুকে। সেখানে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রী শেষ করে দেশে আসবে কদম। কদমের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে শুকুর আলীর বাড়িতে সাড়ম্বর আয়োজন চলছে। আত্মীয় স্বজনদের খবর দেয়া হয়েছে, গ্রামের মানুষ দাওয়াত পেয়েছে।

-দেখো হালিমা। মানুষ এমনিই জানবে। ফুল ফুটলি গন্ধ ছড়ায়। খাসি মারার দরকার নেই। কপট সংযম প্রকাশ করে শুকুর আলী।

-কদমের বাপ আমার আনন্দরে মাটি করবানা কলাম। একদিন না, দরকার হলি তিন দিন ধরে অনুষ্ঠান হবি। খাওয়া দাওয়া হবি, গান হবি, মিলাদ হবি। ঝাঁজের সাথে বলে হালিমা।

-হালিমা তুমি না আমারে সকালে ক'লে একদিন শুধু অনুষ্ঠান হবি? এখন কচ্ছ তিন দিন। শুকুর আলীর মাথায় খরচের চিন্তাটাও কাজ করে।

হালিমা খাতুন দমবার পাত্রী নয়। তার পুত্র আমেরিকা কাঁপায়ে দিয়ে বাড়ি আসতেছে। তা মা হয়ে হালিমা বেগম একটু আমোদ-অনুষ্ঠান করতি পারবিনে, তা কি হয়? কত জন কত অছিলায় আমোদ করে। আর এটাতো জ্ঞানের ব্যাপার।

-আমি অনুষ্ঠান করবোই। হালিমা হয়তো শুকুর আলীর খরচের ভয়ের ব্যাপারটাও ধরতে পারে।

-ও তুমি খরচের চিন্তা করতিছো। আমি বাপের বাড়ি থেকে যা আনে দিছি তাতে এমন ১০০টা অনুষ্ঠান করা যাবি। হালিমার কণ্ঠ উঁচুতে উঠতে থাকে।

-বুদ্ধিমান শুকুর আলী কথা আর বাড়তে দেয় না।

বড় রাস্তার মুখে বড় করে তোরণ নির্মাণ করা হচ্ছে। তোরণে লেখা হয়েছে "হে আধুনিক, হে রাজন- আমাদের অহঙ্কার, তোমাকে স্বাগতম"। তোরণ নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পড়েছে কদম আর আরিফের তিন বাল্যবন্ধু কাজল, বাবুল আর টোকনের ওপর। একজন গ্রামের স্কুলের শিক্ষক, একজন বাজারের দোকানদার আর একজন বর্গাচাষী। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিন বন্ধুতে আলাপ চলতে থাকে।

- কি রে বাবুল ঢুলিদের বলা হয়েছে? আর গান গাতি নজরুল ফকির আসবিতো? কাজল জানতে চায়।

-আসবিনে মানে, অবশ্যই আসবি। নজরুল ফকির রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার জন্যি গীতাকেও নিয়ে আসবি। উত্তর দেয় বাবুল।

-রবীন্দ্র সংগীত না হলি আবার সংস্কৃতি। কদমের পছন্দ হবি ব্যাপারটা। ওর রুচিটা আগাগোড়াই একটু হাই ক্লাসের। গদ গদ ভাব কাজলের কণ্ঠে।

-হ্যা ও ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃতি স্বভাবের। পোশাকে আশাকে ছিমছাম। কথা তো না, যেন আর্ট। কি সুন্দর আববৃতি করতো। বাবুল যোগ করে।

-করতো মানে। এখন আরও সুন্দর করে ইংলিশ কবিতা আববৃতি করে। যেন কদমের আবৃত্তি রোজই শুনে থাকে কাজল।

-ওর যা ঢক। এখন নিশ্চয় আট আট ভাব আরও বাড়ে গেছে। চুপচাপ থাকা টোকন বলে।

-আট নয়, আর্ট। টোকনের ভুল সংশোধন করে দেয় বাবুল। বর্গাচাষী টোকন তোরণে ফিতা ঝুলাতে থাকে।

-প্লেন কটায় আসবি? বাবুল জানতে চায় কাজলের কাছে।

-চলে আসবে। আমার সাথে সাথে করিম মাস্টারের জামাই আদিব তারে নিয়ে গাড়িতে করে সুজা বাড়ি। কখন আসবে সে কথা এড়িয়ে যায় কাজল। আসলে উত্তরটা তার জানা নেই।

-অতো চিন্তা কি? নামলিতো মোবাইল করে দিবেনে। টোকনের স্বগদক্তিমূলক উচ্চারণ।
-এর মধ্যে আবার করিম মাস্টারের জামাই কেন? টোকনের কথায় কান না দিয়ে বাবুল জানতে চায়।
-আরে জামাইতো আরিফ এবং কদমের বন্ধু। তা ছাড়া জামাই-এর বড় ব্যবসা আছে, গাড়ি আছে। রাজায় রাজায় পিরিত। কাজল বুঝিয়ে দেয়।

বাড়িতে আলোকসজ্জা করা হয়। পাকা দেয়াল, বাঁশের খুঁটি, বাঁশের বেড়া, টিনের বেড়া, গাছ - সব কিছুতে সাদা রং করা হয়। রঙ্গিন বেলুনের মস্ত একটা পাঁজা দুইটা বাঁশের মাথায় আকাশ ছোঁয়া উঁচুতে উঠোনে পুতে দেয়া হয়। পাঁচ গ্রাম থেকে বেলুনগুলো দেখা যেতে থাকে। একটা দশাসই উৎসবের সব প্রস্তুতি চলতে থাকে শুকুর আলীর বাড়িতে।

তারপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ১১ জুলাই। অনুষ্ঠানে পৌঁছে গেছেন চেয়ারম্যানসহ সব গণ্যমান্য জন। কদমের পৌঁছানোর কথা বেলা ১২টায়। এখন সাড়ে ১২টা বাজে। দেরি দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। হালিমা খাতুনের হা-হুতাশ শোনা যায়। ঠিক ১২টা ৪০ মিনিটে তোরণের বাইরে এসে দাঁড়ায় আদিবের প্রাদো। পাশাপাশি দুই নধরকান্তি যুবক। তবুও কদমকে চিনে নিতে সমস্যা হয় না কারও। কোট-টাই পরা কদমকে সত্যিই সাহেবদের মত দেখাচ্ছে।

জন প্রতিনিধি হিসাবে একটা বিরাট ফুলের মালা কদমের গলায় পরিয়ে দেন চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম। বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে কদম। দু'পাশ থেকে মেয়েরা ফুল ছিটাতে থাকে। হিন্দু মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে ওঠে। পরিকল্পিত না হলেও পরিবেশের সাথে তা দারুণভাবে মানিয়ে যায়।

কদমের সাথে নানা জন নানা কথার চেষ্টা করে। কিন্তু কথা বেশিদূর এগোয় না। প্রায় ৫ বছর একটানা বিদেশে থাকা কদমের মুখ দিয়ে বাংলার বদলে ইংরেজি বেরিয়ে আসতে থাকে। শুকুর আলী নিজেও আলাপ করতে গিয়ে কদমের ইংরেজি না বুঝতে পেরে হতাশ হয়। সমবেত জনতার কিছু সাধারণ কৌতুহলের জবাবে কদমের বক্তব্যের বাংলা তর্জমা করে দেয় আদিব।

খাবারে ঝাল হওয়ায় কদমের পক্ষে একেবারেই খাওয়া সম্ভব হয় না। খবর শুনে হালিমা খাতুনের আহাজারি শুরু হয়। ছেলের জন্য এক গামলা পায়েশ পাঠিয়ে দেন তিনি। কদম তাও খেতে পারে না। নানা ধরনের প্রশ্ন আর না খেতে পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কদম। কেউ একজন বুদ্ধি করে কফি আনিয়ে রেখেছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে যেন প্রাণ ফিরে পায় কদম আলী।

খাওয়া দাওয়ার পর কদমের নামে তৈরি পুথিপাঠ হয়। কেউ একজন কবিতাও আবৃত্তি করে। সব শেষে শুরু হয় গীতার রবীন্দ্র সংগীত। গানের সাথে সাথে কদমের শরীরের ছন্দ প্রকাশ পায়। তার সাথে পুরো মজলিশও রবীন্দ্র সংগীতের রস আস্বাদন করতে থাকে। কদমের মাথা ডানে দুললে মজলিশ ডান দিকে হেলে পড়ে।

-Oh Tagor, Great Tagor! ....

কবিতার তরঙ্গ কদমের কণ্ঠে। সমবেত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত কদম আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গীতা গীতার মত গান গায়, কদম কদমের মত লেকচার দিতে থাকে। Once great Susmita Sen came to attend a festival at Berkley when I was there. And she performed. What a mesmerizing performance that was! I got desolved কদম আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে।

বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন ধরে। শুকুর আলীর জমি চাষের জন্য মাংলালা (টাকা ছাড়া শুধু ভূরিভোজ করিয়ে জমি চাষ করানো) নেয়া হয়েছে। কদম মাঠে যাবে। হাতে-কলমে মাটি এবং চাষাবাদ নিয়ে মানুষকে জ্ঞান দেবে। ১০টার দিকে কদমের জমিতে যাওয়ার আয়োজন শুরু হয়।
প্রশ্ন দেখা দেয় কদমের ফিল্ড পরিদর্শনের পোশাক নিয়ে।
-লুঙ্গি পরে যাওয়াই ভাল। টোকন বলল।

-না না। ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়ে টোকনের প্রস্তাব। তা ছাড়া কদম লুঙ্গি পরা ভুলেও গেছে।
-শর্টস পরে যেতে পারে। বলল কাজল।
-না না, মাঠে অনেক জোঁক। বললেন কেরামত মাতবর।
-সার্ট প্যান্ট পরাই ভাল। পশ্চিম পাড়ার মদন বলল কথাটা।
-ঠিক। কদম যদি চাষাদের মত লুঙ্গি পরে মাঠে যায় তাহলে আমেরিকা থেকে পিএইচডি করার দরকারটা কি? কেরামত মাতবরের অকাট্য যুক্তি।

কথাটা কদমেরও মনপুত হয়। কদম এই পোশাকে স্বাচ্ছন্দবোধ করে।
-It's alright. I have no problem with this. ওখানেতো সবাই প্যান্ট শার্ট পরে কাজ করে। খুশির সাথে বলে কদম।

কোট টাই পরেই মাঠের দিকে এগিয়ে চলে কদম আলীর বহর। কদমের পাশাপাশি কদমের বন্ধুরা, পেছনে মুরুব্বিরা, আর সবাইকে ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত বেষ্টন করে এগিয়ে চলে এক দঙ্গল শিশু-কিশোর। মাঝে এবং সবার সামনে অপূর্ব সুন্দর স্মার্ট কদম এগিয়ে চলেছে রাজহংসের মত।

রাস্তায় দেখা হয় আরিফের সঙ্গে। আরিফ গত রাতে ঢাকা থেকে বাড়ি এসেছে। ভাল-মন্দ কথা-বার্তা বলতে বলতে আরিফও এগিয়ে চলে মিছিলের সঙ্গে। বাবলাতলার মাঠে ১০/১৫ জোড়া লাঙ্গল চাষ শুরু করেছে। বেশ সন্তর্পনে মিছিলটি এগিয়ে যেতে থাকে চিকন আল ধরে। দু'পাশে কাদাপানির পেক। নিজেদের জমির মাঝামাঝি এসে আলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে কদম।

-রহিম চাচা আমাকে দ্যাওতো। বলেই লুঙ্গির খোট মাজায় কষে বেঁধে রহিম বক্সের হাত থেকে লাঙ্গল নিয়ে চালাতে থাকে আরিফ। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হলেও ভালভাবেই সামলে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় পাস এই যুবক।
-প্যাকানোতো ভাল হচেছ সুরত আলী। বললেন বিমল সাহা।
-No, no. চাষ deeper into the soil হতে হবে। আর লাঙ্গল দিয়ে সময় অপচয় না করে we should use machine. It will save both money and time. কদম আলীর সুচিন্তিত মতামত।
-ঠিকই কইছে কদম। লাঙ্গল দিয়ে চাষের যুগ আর নেই। সমর্থন করে কাজল।

রতনপুরের সুবহান মৃধার তেজি দামড়ার জোঁত যাচ্ছিল পাশ দিয়েই। গরু প্রজাতির প্রতি মানব সন্তানের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের আলোচনাটা বুঝতে পেরেই হয়ত তেজি দামড়া দু'টো তেড়ে এলো কদমের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গিয়ে কদম পা ফসকে পড়ে গেল পেছনের পেকের মধ্যে। কাঁদা পানিতে কদমের জামা-জুতো একাকার। আরিফ, টোকনরা ধরাধরি করে কদমকে দাঁড় করিয়ে দিল। সুবহান মৃধাও ততক্ষণে গরু দু'টিকে সামলে নিয়েছেন। সয়েল সায়েন্স নিয়ে চাষীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া আর হল না সেদিন। হতভম্ব ড. কদম আলীকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসা হল।

পরদিন গ্রামের লোকদের ডাকা হল শুকুর আলীর বাড়িতে। ড. কদম সবাইকে ধান চাষ বাদ দিয়ে অর্থকরী ফসল গম এবং আলু চাষের পরামর্শ দিল।
-ধান চাষ বাদ দিতে হবে। উচ্চ ফলনশীল গম চাষে আজ আপনারা প্রতি বিঘায় যা আয় করেন তার পাঁচ গুণ বেশি আয় করতে পারবেন।
-কিন্তু আমাদের গ্রাম তো একটু নিচু। আর মাটি ধানের জন্যি ভাল। তাছাড়া এই সময় গমের সময়ও নয়। রহিম মুন্সী আস্তে ধীরে বলে কথাগুলো।
-আধুনিক চাষে কোন সময় অসময় নেই। কদম আলীর মত জানা যায়। তাছাড়া কোথায় কি হয়, না হয় - তারও কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই।
-ঠিক। আমাদের দেশেই আগে ধান হত দুইটা। এখন ধান হয় তিনবার। সারা বছর আম পাওয়া যায়। শীতের সব্জী গ্রীষ্মকালেও পাওয়া যাচ্ছে। মোক্ষম যুক্তি তুলে ধরে কাজল।
-এ ছাড়া লাভের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। কদমের নিরাশক্ত গলা।

ধানের বদলে গমের চাষ করার ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল। যাদের ঘরে গমের বীজ রাখা ছিল তারাতো সহজেই ব্যবস্থা করতে পারল। আর যাদের বাড়িতে গমের বীজ ছিল না তারা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নানা কথা বলে বীজ সংগ্রহ করল। কেউ কেউ বাজার থেকে বীজ কিনে আনল।

গ্রামের বড় মাঠটাতে এবার বর্ষায় ধানের বদলে গম বোনা হল। কয়েকদিন পর কোন জমিতে ভাল আবার কোন জমিতে অল্প অল্প চারা বের হয়। যাদের জমিতে ভাল চারা বের হল তারা খুশিতে ডগমগ। আর যাদের জমিতে ভাল হল না তারা কদম আলীর কাছে ধরনা দেয়।
–আরে বেশি চারা ভাল নাতো। গাছ একটু কম হলে ফলন ভাল হয়। সবাইকে আশ্বস্ত করল কদম।

বেশ কয়েকদিন তেমন বৃষ্টি নেই। গমের চারাগুলি লকলক করে বেড়ে উঠছে। সবার মনে অসময়ে গম এবং বেশি দামের হাতছানি। ড. কদমের কদরও বেড়ে গেছে গোটা এলাকায়। নরসিংহপুর গ্রামের মানুষ গর্ব করে ড. কদম আলীকে নিয়ে। কদম আলীও খুশি জীবনের প্রথম এককভাবে পরিচালিত নিজের পরীক্ষামূলক এই চাষ প্রক্রিয়ার সাফল্য দেখে।

তারপর একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি একটানা চলল তিন চার দিন। চারা সব পানির নিচে চলে গেল। আল কেটে, অন্যান্যভাবে পানি বের করার চেষ্টা করলেও পানি বের হল না। আবার দুদিনের খরায় যখন পানি কমল তখন গমের লকলকে চারাগুলি মাটিতে মিশে গেছে।

মাথায় হাত পড়ল মানুষের!

ড. কদম আলী সবাইকে বোঝাল পানি বের করে দিতে পারলে এই সমস্যা হত না। সুতরাং পানি বের করে দেবার জন্য জমি কেটে একদিকে ঢালু করে দিতে হবে, আল রাখা চলবে না।

দু'একজনের মৃদু উৎকণ্ঠা অন্যদের কানে পৌঁছালো না। নব উদ্যমে গ্রামের মানুষ মাটি কেটে একদিকে ঢালু করে ফেলল, আর আল উঠিয়ে দিল। অনেকটা সমবায়পন্থার মত ব্যবস্থা। বোরো চাষের সময় বোরিং করে পানি তুলে চাষ করা হল। চারাও রোপন করা হল। কিন্তু সমস্যা হল যখন পানি দেওয়ার দরকার হল তখন। যত পানিই উঠানো হল তা ঢালের উপরের দিকে দাঁড়াল না। নেমে গেল নিচের দিকে। এতে উপরের দিকে যেমন শুকিয়ে গেল অন্যদিকে নিচের দিকে পানি জমে চারাগুলো পঁচে গেল।

আল না থাকায় অনেকের মধ্যে শুরু হল ঠেলাঠেলি। করিম সিকদার আর রহিমুদ্দির মধ্যে এক কথা দু'কথার পর শালিস হল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। রহিমুদ্দির ছেলে সলিম একদিন করিম শিকদারের ছেলে ঠান্ডুর মাথা ফাটিয়ে দিল। গ্রামে কাজিয়া বেঁধে গেল।

সব রাগ এসে পড়ল কদম আলীর উপর। কদম এখন আর রাস্তায় বের হতে পারে না। তাকে দেখলেই লোকে হাসাহাসি করে, শিশুরা পাগল বলে। অবস্থা বেগতিক দেখে চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম তাকে এলাকা ছেড়ে ঢাকায় যেয়ে চাষের বদলে কৃষি গবেষণায় মনোযোগ দিতে পরামর্শ দিলেন। 'এ দেশে কিছু হবে না' এই কথা জানিয়ে দিয়ে ড. কদম আলী ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সকাল ১০টা ৫৩ মিনিটের এমিরেটস–এর ফ্লাইটে চেপে উড়ে গেল আমেরিকা।

মনে পড়ে তোমাকে

মোঃ ওয়ালিদ হোসেন
কিউ.এ., অবনী নীটওয়্যার লিঃ

মনে পড়ে তোমাকে
রাতের শিশির ভেজা
গোলাপের বাগানে ।

মনে পড়ে তোমাকে
বর্ষার রিমঝিম শ্রাবণে ।

মনে পড়ে তোমাকে
শরতের তারা ফোটা আকাশে ।

মনে পড়ে তোমাকে
কার্তিকের নবান্নে ।

মনে পড়ে তোমাকে
শীতের কুয়াশার চাদরে ।

মনে পড়ে তোমাকে
বসন্তের কোকিলের কুহুতানে ।

মনে পড়ে তোমাকে
পড়ন্ত বিকালের সুশীতল ছায়াতে ।

মনে পড়ে তোমাকে
আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে ।

আমার স্বপ্ন তুমি

মিলন মিয়া
সিনিয়র অপারেটর, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

ব্যাবিলন তুমি স্বপ্ন আমার
তুমি আশার আলো
ব্যাবিলন তুমি রত্ন আমার
বেসেছি তোমায় ভালো ।

কাজ করে যাই হাসি-খুশি মনে
বহুদিন ধরে এই ব্যাবিলনে
ব্যাবিলন আমার আঁধার ঘরের বাতি
বিপদে আমার পাশে দাঁড়ায় দিন ও রাতি ।

ব্যাবিলন তুমি স্বপ্ন আমার
সকল আশার আলো
ব্যাবিলন তুমি রত্ন আমার
তোমাকেই বাসি ভালো ।

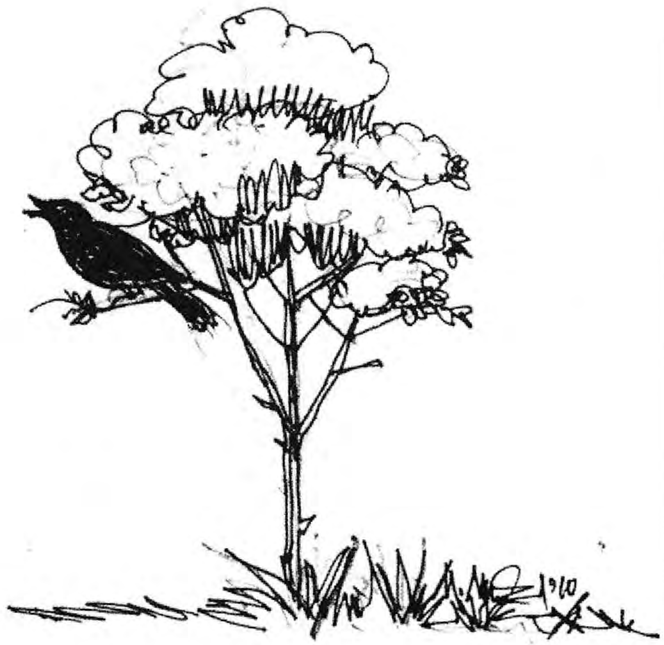

আজব শহর ঢাকা

মোঃ সোলায়মান হোসেন
কিউ.সি.আই, ফিনিশিং, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

গ্রাম থেকে বাসে চড়ে
যখন এলাম ঢাকা
মাস্তান এসে পিস্তল ধরে
বললো দেরে টাকা।

হাত ঢুকিয়ে দেখি তখন
পকেট আমার ফাঁকা
পকেটমার সেরেছে কাজ
বানিয়ে আমায় বোকা।

সোনার দেশের এই শহরেই
ধৈর্য্য ধরে থাকা
শহর শহর ঢাকা শহর
আজব শহর ঢাকা।

ব্যাবিলন তুমি আমার

ইমরান খান
কিউ. সি., অবনী নীটওয়্যার লিঃ

ব্যাবিলন তুমি আমার সকাল দুপুর
তুমি আমার সন্ধ্যা
তুমি আমার সকালের গোলাপ
কিংবা রজনীগন্ধা।

তুমি আমার গ্রীষ্ম – বর্ষা
শরৎ কিংবা হেমন্ত।
তুমি আমার শীতের সকাল
পাখি ডাকা বসন্ত।

ব্যাবিলন আমার কৃষ্ণচূড়া
জুঁই-চামেলী-হাসনাহেনা
তুমি আমার জীবন নদী
বয়ে যাওয়া যন্ত্রণা।

তুমি আমার হাসি-কান্না
বুক ভরা বেদনা
ব্যাবিলন আমার কণ্ঠের গান
আমার মনের বাসনা।

ব্যাবিলন আমার ভালবাসা
মুখ দেখারই আয়না
তুমি আমার ভোরের সূর্য্য
আমার হৃদয়ের ময়না।

মাছরাঙ্গা

শেখ মাছুম
স্যাম্পল ম্যান, প্যাটার্ন, অবনী নীটওয়্যার লিঃ

মাছরাঙ্গা পাখিরে, মাছ খাবি নাকি রে?
তবে তেড়ে আয় না
মিছে কেন বায়না?

আমাদের বিলেতে, মাছ খায় চিলেতে।
তুই কেন এলিনা?
পরে এলে পাবি না।

সুন্দরী

মোস্তাফিজুর রহমান
অবনী নীটওয়্যার লিঃ

সুন্দরীদের কম্পিটিশন
নয়তো মোটেও ফান ।
ওদের প্রতি সবার আছে
অন্য রকম টান ।

তাবৎ জগত অচল হবে
সুন্দরীদের ছাড়া
পত্রিকাতে থাকছে ছবি
তাইতো নজর কাড়া ।

সমালোচক এসব নিয়ে
নানান কথা বলে
প্রযুক্তির এই যুগে কি আর
খোড়া যুক্তি চলে?

সুন্দরী কম্পিটিশন
দোষের কিছুই নয়
সমালোচক এসব নিয়ে
আলোচিত হয় ।

বর্তমান রাজনীতি

মোঃ মহানুর ইসলাম
কিউ.এ., ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

আমাদের রাজনীতি চলে বাঁকে বাঁকে
ফাল্গুন এলে তার হাঁটু জল থাকে ।
পার হয়ে যায় নেতা, পার হয় নীতি
সকলের মাঝে থাকে ভালো ভালো স্মৃতি ।

চিক্ চিক্ করে মুখ বক্তৃতা দিলে,
ভাষা শুনে কারো কারো চমকায় পিলে ।
কিচি মিচি করে সেথা জনতার ঢল
হাবু-ডুবু খাওয়া নেতা ফিরে পায় তল ।

সকালে বিকালে চা খাওয়া হলে পরে
মিছিলে স্লোগান তারা ধরে উঁচু স্বরে ।
বোমা মেরে, ভয় দেখিয়ে চাঁদা তোলে বেশ
সেই টাকা চাইনিজে করে গিয়ে শেষ ।

আর পারে বই মেলা, মিনারের তীর
সংগীতে কবিতায় মানুষের ভীড় ।
সব গান থেমে যায় থামে বক্তৃতা
রাজনীতি জিভে তখন লাগে বড় তিতা ।

বৃষ্টির গান

মোঃ বাবুল
কিউ.সি. সুপারভাইজার, কোয়ালিটি
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

নদী টলমল
জল কলকল,
ভরা বরষায়
মেঘ গরজায়।
কাঁপে তালবন
ভেজে শালবন,
ফোটে কেতকী
ফোটে কামিনী।
ডোবে পথ-ঘাট
ধানে ভরা মাঠ,
ভরা বরষায়
মন উতলায়।
পুবে বিদ্যুৎ
শুধু চমকায়,
এই মন প্রাণ
ভেজে দমকায়।
ভরা বরষায়
মেঘ গরজায়,
এই ধরণী
বেশ প্রাণ পায়।

কর্মই ধর্ম

মোঃ ফরহাদ নাসিম
সুপারভাইজার, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

বিশৃঙ্খলা নয়রে ভাই
চল সবাই মিলে কাজে যাই।
শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
রেষা-রেষি ভুলে যাই।

ভন্ড শ্রমিক নেতা যারা
গার্মেন্টস শিল্পের শত্রু তারা
ওদের কথায় নাচে যারা
হবে তারা সর্বহারা।

তাই বলিরে শ্রমিক ভাই
চল সবাই কাজে যাই
সৎ উপায়ে টাকা কামাই
প্রিয় জনের মুখে হাসি ফোটাই।

নিজের গল্প

আশিষ
ম্যানেজার, মেইনটেন্যান্স,
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ

ভেবেছিলাম হব কবি
রবি ঠাকুরের মত
না হলেও নজরুল হব
আশা ছিল শত ।

তা ছাড়াও ছিল সখ
নামব চলচ্চিত্রে
ব্যর্থ হলে পরের চয়েস
রেডিও কি টিভিতে ।

লেখকও হতে পারি
শখ ছিল অল্প
খুব ভাল বলতে পারি
মিষ্টি মধুর গল্প ।

সব চেয়ে বড় আশা
হব বড় বিদ্বান
গল্প ছেড়ে গাইতে পারি
ব্যাবিলনের জয়গান ।

তিন কাল

মোঃ আহসান হাবীব সোহেল
ডিজাইনার, ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিঃ

অতীত সে তো হারিয়ে গেছে
ডেকোনা তাকে পিছু
সুখ যদি মুখ ফেরালো
সেধোনা তাকে কিছু ।

হতাশার অবসাদে
ক্ষয় করোনা শক্তি
বুক ফাটিয়ে কেঁদোনা বন্ধু
হাহাকারে নেই মুক্তি ।

বর্তমানই সঙ্গী তোমার
তাকেই ভালবাস
বর্তমানেই জীবন রাঙাও
দু'চোখ ভরে হাসো ।

হাল ছেড়োনা বন্ধু আমার
বুকে বাধো জোর
ঘোর কাটবেই আগামীতে দেখো
আসবে সোনার ভোর ।

শ্রাবণ ধারা নেমেছে অঝোরে

ইমদাদুল হক রনি
অফিসার, মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং, ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ

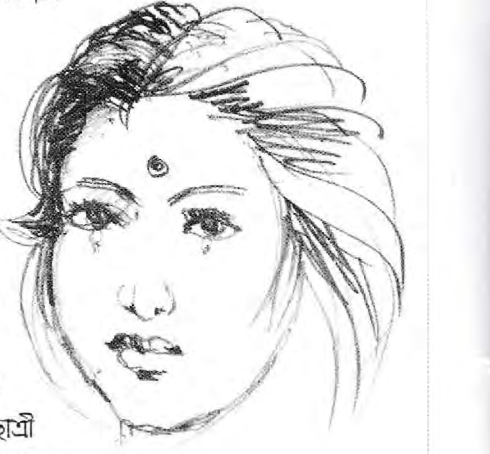

'মিথিলা'- তিন বর্ণের নাম। কিন্তু সেটাকে প্রায় সবাই সংকুচিত করে দুই বর্ণে নামিয়ে এনেছে। সবাই ডাকে 'মিথি'।

মিথিলাকে একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে। সে আর পারছে না। একটু বিরতি চায় সে। H.S.C পরীক্ষার পর ভেবেছিল একটু স্বস্তি পাবে। কিন্তু হয়েছে তার উল্টোটা। বরং ভার্সিটি ভর্তির প্রিপারেশনে সে একেবারে বিরক্ত। সারাক্ষণ পড়া, পড়া আর পড়া। সে কয়েকটা দিন নিজের মত করে থাকতে চায় – একেবারে পড়াশুনা ছাড়া। সে সিদ্ধান্ত নিল, আগামী পাঁচ দিন মোটেও বইয়ের দিকে তাকাবে না, ভুলেও না। পড়াশুনা বর্জিত ছাত্রী জীবন। বড়ই অদ্ভুত একটা ব্যাপার। সে প্রচন্ড শিহরণ অনুভব করল। শিহরণে তার শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল।

একটা বিষয় তবু মনের ভিতর খচ্ খচ্ করতে থাকে তার। আগামী কাল পরীক্ষার রেজাল্ট হবে। রেজাল্ট আশানুরূপ হবে তো? – এই চিন্তাটা বার বার মাথায় উঠে আসছে। কিছুতেই দুরে রাখা যাচ্ছে না। তাই সে এখন অন্য কিছুতে ডুবে থাকতে চায়। ইদানিং সে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, ক্রমেই পলাশ ভাইয়ের প্রতি তার আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। অসম্ভব রকমের ভাললাগা কাজ করে তার প্রতি। সে যখন পলাশ ভাইকে নিয়ে কিছু ভাবে তখন অন্য সব কিছু ভুলে যায়। সে এখন পলাশ ভাইকে নিয়ে ভাবতে চায় অন্য সব কিছু ভুলে। সে ভাবতে লাগল।

বাসা থেকে সকালে বের হওয়ার সময় মিথিলা বার বার ছাতাটা নিয়ে বের হতে বললেও ঝক্ঝকে চক্চকে আকাশ দেখে পলাশ আর ছাতাটা নেয়নি। সব সময় হাতে করে কিছু একটা বয়ে বেড়ানো বিরক্তিকরও বটে। ছাত্র-ছাত্রীরা কোন একটা কারণে আজকে শেষের ক্লাস ছুটি নিয়েছে। তাই পলাশ একটু আগেই বের হয়ে গেছে ভার্সিটি থেকে। কদিন আগেও পলাশ ছাত্র ছিল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এখন সে একজন শিক্ষক। পলাশ বাস স্টপেজের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে গাড়ির জন্য। কিন্তু গাড়ির দেখা নেই। এর মাঝে একটা শীতল হাওয়া বয়ে গেল। কাছে কোথাও হয়তোবা বৃষ্টি নেমেছে। আষাঢ়-শ্রাবণের এই একটা সমস্যা – বলা নেই, কওয়া নেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝক্ঝকে রোদের ঝিলিক। যা ভেবেছিল! কয়েক টুকরো গাঢ় মেঘ উড়ে এল। পলাশ চেয়ে দেখছিল মাথার উপর মেঘের আয়োজন। দেখতে দেখতেই কিছু মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ল। একেবারে পলাশকে লক্ষ্য করে যেন। সে নড়ার সময়ও পেল না। ভেজা কাকের মত ভিজতে থাকল সে। আশে পাশে তাকিয়ে দেখল অবাক দৃষ্টিতে দেখছে সবাই তাকে। অন্য সবাই ঠিকই সময়মত ছাউনির নিচে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু পারেনি পলাশ। সবার অবাক দৃষ্টি দেখে তার বেশ ভালই লাগল যে, সে অন্য সবার চেয়ে কিছুটা হলেও আলাদা। বাসে উঠার পর লক্ষ্য করল কেউ তার পাশে বসছে না, পাছে ভিজে যায়! পলাশ মনে মনে হাসল আর আপন মনে দু'সিট জুড়ে বসে থাকল। জানালাটা একটু খুলে দিল। বৃষ্টির ছাঁট তার চোখে-মুখে এসে পড়তে লাগল। সে পরম সুখে তলিয়ে গেল। কে যেন বলল – 'জানালাটা বন্ধ করেন, ভিজে যাচ্ছি তো'। পলাশ শুনেও শুনল না।

কলিং বেল বাজছে। গেট খুলে পলাশের আপাদ-মস্তক দেখে মিথিলার মেজাজ ভীষণ গরম হয়ে গেল। বার বার বলার পরও ছাতাটা নেয়নি। শ্যামলা মানুষ কিন্তু দেখাচ্ছে কুচকুচে কাল। মিথিলা শীতল কণ্ঠে বলল – 'যাও না, আর একটু ভিজে এসো – এখনো তো বৃষ্টি হচ্ছে'। বেরিয়ে যাচ্ছিল পলাশ, মিথিলা পলাশের ডান হাতটা সজোরে টেনে ধরল। পলাশ এসে একেবারে হুড়মুড় করে পড়ল মিথিলার উপর। মিথিলা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। পলাশকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল।

– 'এই মিথি...মিথি ওঠ্‌ ওঠ্‌। এখানে চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছিস কেন? বৃষ্টিতে ভিজে গেলি যে'। মিথিলার মা পাশের রুমে চলে গেলেন জানালা বন্ধ করতে। মিথিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিল। বাইরে তাকিয়ে দেখল পলাশ ফিরছে রাস্তা দিয়ে। সে আসছে পা মেপে মেপে, বাম কাঁধে একটা ব্যাগ আর ডান হাতে একটা ছাতা। কাছে আসতেই দোতলা থেকে মিথিলা চেঁচিয়ে উঠল –

–'পলাশ ভাই'।

–'বৃষ্টিতে ভিজেছো বুঝি? বেশি ভিজ না, জ্বর আসবে'। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় পলাশ ছাতাটা গুটিয়ে নিল।

–'তোমার মনে আছে তো? কাল সারাদিন কিন্তু আমার সাথে ঘুরতে হবে'।

পলাশ মৃদু হাসি দিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ সে আসবে। পলাশকে হঠাৎ করে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। তার গায়ের রং হলুদাভ হয়ে গেছে একটা হলুদ আভায়। তার রঙ আসলে শ্যামলা। কিন্তু এই শেষ বেলায় সে যেন জ্বল জ্বল করছে। মিথিলা আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল বিশাল রঙধনু দেখে। সে তাকিয়ে রইলো অপলক নয়নে। রঙধনু রঙে পলাশ ভাইকে অন্যরকম লাগে। এখন থেকে তার একটা নাম দিলে কেমন হয়– রঙধনুর পলাশ। সে আপন মনে বিড় বিড় করে বলেই চলল – রঙধনুর পলাশ, রঙধনুর পলাশ......

পরের দিন খুব ভোরে মিথিলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আজ পহেলা শ্রাবণ। কিন্তু আকাশ একদম ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। মিথিলা কানে হেডফোন লাগিয়ে FM Radio শুনছে। শ্রাবণের সুন্দর একটা রবীন্দ্র সংগীত। মিথিলাও গানের সাথে গলা মেলাতে লাগল–

"আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে দুয়ার কাঁপে..........
ক্ষণে ক্ষণে ঘরের বাঁধন যায়..... যায় বুঝি আজ টুটে...."

গান শুনতে শুনতে মা'কে একটা চিঠি লিখে ফেলল –

মামনি,

পহেলা শ্রাবণের শুভেচ্ছা নাও। তুমি ঘুমাচ্ছ। তোমার উঠতে দেরি হবে এটা জানি। কারণ, তুমি অনেক রাত ধরে 'তারে জমিন পর' দেখেছ আর কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছো। আমি বের হচ্ছি। সারাদিন পলাশ ভাইয়ের সাথে ঘুরব। তাকে আগেই বলে রেখেছিলাম। জানো মামনি, আমি কিছু বললে পলাশ ভাই কখনো না করে না, তার অনেক কাজ থাকলেও। আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার প্রতি নিশ্চয় তার কোন ভাললাগা কাজ করে। তবে তোমার বোনটাকে আমার একদম পছন্দ হয় না। যদি কখনো তার ছেলের বউ হই বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল! এটা ঠিক পলাশ ভাইকে আমার খুব ভাল লাগে। দিনে দিনে তার প্রতি আমার ভালো লাগা বেড়েই চলেছে। আজকে তাকে একটা পরীক্ষায় ফেলতে চাই।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা কি জান মা? আজ আমার H.S.C পরীক্ষার রেজাল্ট বের হচ্ছে অথচ আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা হচ্ছে না, ভয়ও লাগছে না। কাজের কথা শোন –

এক. আজ সারাদিন আমার মোবাইল বন্ধ থাকবে। অতএব ফোন করলেও পাবে না।

দুই. পলাশ ভাইয়ের মোবাইলে সকাল ৯টা থেকে ৯.১৫ পর্যন্ত পাবে। এরপর আমার নির্দেশে ওটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

তিন. মুনমুনকে তো চেন। আমাদের এখানে আসে আর তোমার হাতের মাখানো ঝাল মুড়ি খেতে চায়। ওকে ফোন করলেই আমার রেজাল্ট জানতে পারবে। ওকে বলে রেখেছি। ওর নাম্বারগুলো নিচে দেখ –

০১৭১ ০১১২২৩৩

০১৯১ ০১১২২৩৩

০১১১ ০১১২২৩৩

০১৮১ ০১১২২৩৩

০১৬৭ ০১১২২৩৩

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ? ওর নাম্বারগুলোর শেষের ৭টি ডিজিট সব একই। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার না? ওর ছোট মামা স্বরাস্ট্র প্রতিমন্ত্রি না হয় মন্ত্রী কিছু একটা হবে। উনিই ওকে সিম পাঠিয়ে দেন নতুন অপারেটর আসলেই।

জানো মামনি, আজ বাবাকে অনেক মিস্ করছি। বাবাকে নিয়ে লেখা ডায়েরির পাতাগুলো পড়েছি আর অনেক কেঁদেছি।

আমি পাঁচটার আগেই ফিরব। লক্ষ্মী মামনি আমার। রাগ কর না কিন্তু...

মিথি

রিকশায় উঠেই মিথিলা বলল –

– 'পলাশ ভাই, তোমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হল। এর মধ্যে কারো সাথে কথা থাকলে সেরে নাও। এখন ৯.১৫। তুমি সময় পাবে ৯.২৫ পর্যন্ত এবং তার পরেই তোমার মোবাইলটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। সারাদিন ওটা আমার জিম্মায় থাকবে'। পলাশ নির্বাক মিথিলার দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হল মেয়েটা দিনে দিনে যতটা চঞ্চল হচ্ছে ততটাই যেন রূপবতী হয়ে উঠছে। পলাশ একভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।

–'এই পলাশ ভাই, তোমার কি হল? এভাবে চেয়ে আছ কেন? আমার কিন্তু বড্ড বিরক্তি লাগছে'।

পলাশ বলে না যে সে কোথায় হারিয়ে গেছে। পলাশের ফোন বাজছে। তবুও পলাশ অপলক, স্থির। এবার মিথিলা পলাশকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তোমার মোবাইল বাজছে। রিসিভ কর'।

পলাশ ফোন রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো। বড় আপা'?

বড় আপার উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসে – 'শোন্ পলাশ, এখন সমাজে মুখ দেখাই কেমন করে বল তো? রুদ্র তো পরীক্ষায় ডাব্বা মেরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। রাগের মাথায় আমি ওর দুগালে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক করিনি। আর শোন, মিষ্টির দোকানে ফোন করে বলে দে মিষ্টি লাগবে না। ভেবেছিলাম পাছে যদি মিষ্টি না পাওয়া যায় তাই আগেই বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম, এদিকেতো ছেলে লাড্ডু পেয়ে বসে আছে। মান-সম্মানের আর কিছু বাকি রইল না'। পাশ থেকে রুদ্রের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

–'আপা মাথা ঠান্ডা কর। আর রুদ্রকে বল এখন থেকে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে। পরের বার যেন কোন মতেই রেজোল্ট খারাপ না হয়। আমি মিষ্টির দোকানে বলে দিচ্ছি'।

পলাশ ফোন দিল মিষ্টির দোকানদার জগদীশ লালকে। ফোন ধরেই জগদীশ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা কোথায় আছেন? মিষ্টি তো রেডি। তাড়াতাড়ি আসেন। মিষ্টি রাখা মুসকিল হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর চাপ'।

পলাশ গম্ভীর গলায় বলল, 'জগদীশ দা, মিষ্টি বেঁচে দিন। ভাগনে ফেল করেছে'। পলাশ ফোন রেখে মিথিলার দিকে তাকাল।

– 'পলাশ ভাই, মন খারাপ হয়ে গেল'?

– 'কিছুটা'।

– 'একটা কাজ করবে'?

– 'বল'।

– 'তোমার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে আমার এই রোল নাম্বার আর বোর্ডের নাম লিখে ২৩২৩ নাম্বারে পাঠিয়ে দাও তো'।

পলাশ মেসেজ পাঠাতেই ফিরতি মেসেজ পেল। সে চিৎকার করে উঠল– 'তুমি A+ পেয়েছো'।

– 'আচ্ছা। তাই বলে এত জোরে চেঁচাবে'?

– 'তুমি তো শুধু A+ পাওনি। পেয়েছো গোল্ডেন A+'। মিথিলাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে আবার

মিষ্টির দোকানে ফোন করল। 'জগদীশ দা, মিষ্টিগুলো রেখে দাও। বেঁচো না কিন্তু। আমি আসছি'।

– 'এটা কি হল? একজন পরীক্ষায় খারাপ করে কান্নাকাটি করবে আর একজন পাশ করে গপ্ গপ্ করে মিষ্টি খাবে আর আনন্দ করবে'?

– 'হ্যাঁ, তাই করবে। এটাই নিয়ম'।

– 'এবার তোমার মোবাইলটা দাও। এটা বিকাল ৫টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং আমার কাছে থাকবে'। পলাশ কখনই মিথিলার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। কিন্তু আজ ব্যাপারটি উল্টো হয়ে গেছে। ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলতেই ভালো লাগছে। আর মুখের দিকে চেয়ে থাকলে মনটা প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে।

– 'পলাশ ভাই'? পলাশ কিছু শুনল না।

– 'পলাশ ভাই'? গলা চড়ায় মিথিলা।

পলাশ নড়ে ওঠে। 'কিছু বললে'?

– 'তোমার কি হয়েছে বলতো'?

– 'কই কিছু নাতো'?

– 'রিকশাওয়ালাকে কবরস্থান যেতে বল'।

পলাশ ভিন্ন কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল – না, আজকের দিনটা শুধু মিথিলার।

* * * * * * * * *

পলাশ মিথিলার পাশে এসে দাঁড়ায়। মিথিলার দু' গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে। সে মিথিলার ডান কাঁধের উপর তার একটা হাত রেখে বলল – 'কবরে এসে কান্না করতে নেই। খালু কষ্ট পাবেন'। মিথিলা পলাশের কাঁধের উপর তার মাথাটা রেখে অঝরে কাঁদতে লাগল।

মিষ্টির দোকান 'জগদীশ ভান্ডারে' এসে পলাশ একটার পর একটা মিষ্টি খেয়েই চলেছে। মিথিলা অবাক হচ্ছে তার এই কান্ড দেখে। কারণ যে কখনো মিষ্টি ফিরেও দেখে না, মিষ্টি যার অপছন্দের শীর্ষে, সে কিভাবে এটা পারে? তবে আজ যেন অনেক কিছুই উল্টা-পাল্টা ঘটছে। মিষ্টি মিথিলার খুব প্রিয় হলেও তার মোটেও মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে না আজ। তবে হ্যাঁ পলাশ যদি তাকে একটি মিষ্টি খাইয়ে দেয় তাতে সে মোটেও আপত্তি করবে না। কিন্তু সে আশা বড়ই ক্ষীণ। সে চেয়ে চেয়ে পলাশের মিষ্টি খাওয়া দেখতে লাগল।

পলাশের জন্য ছোট্ট – একটা পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। রিকশায় উঠে মিথিলা পলাশের অগোচরে কপালের টিপটা একটু সরিয়ে লাগাল। যাতে দেখে মনে হয় টিপটা ঠিক জায়গায় পড়েনি। এই বিষয়টা যদি পলাশের চোখে পড়ে এবং পলাশ ঠিক করে দেয় তাহলে মিথিলা ধরে নেবে যে পলাশ তাকে ভীষণ ভালবাসে। যদিও এটা একটা খুবই ছোট্ট – পরীক্ষা। হয়তোবা পলাশের চোখেই পড়বে না ব্যাপারটা। কিন্তু মিথিলার মনে হয় কাউকে জানার বা বোঝার জন্য ছোট্ট – একটা বিষয়ই যথেষ্ট। পলাশ বার বার মিথিলার দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কিছুই বলছে না। সে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। মিথিলা অপেক্ষা করছে কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটছে না।

বাসার গলির মোড় ঘুরতেই 'স্যার, স্যার' বলে একটা মেয়ে চেঁচাতে লাগল। পলাশ পেছনে তাকিয়ে দেখল একটা মেয়ে একগুচ্ছ কদম ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে চিনতে তার অসুবিধা হল না। সে রিকশা থেকে নেমে বলল, 'মিথি, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি আসছি'।

দূর থেকে পলাশ আর মেয়েটির ফুল দেয়া-নেয়া আর কথা-বার্তা দেখে মিথিলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে দ্রুত পায়ে বাসার মধ্যে ঢুকে গেল। তার শুধু মনে হচ্ছে সে তার সবচেয়ে মূল্যবান কিছু একটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে ফেলছে। সে কিছুই করতে পারছে না। তার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠছে। সবকিছু কেমন ফিকে লাগছে তার। দরজা খুলে মিথিলার দিকে তাকিয়ে মায়ের আর বুঝতে বাকি রইল না যে মিথিলার কিছু

একটা হয়েছে। তিনি কোন কথা না বলে দরজার একপাশে সরে দাঁড়ালেন। মিথিলা দৌড়ে তার রুমে চলে যাচ্ছিল আবার ফিরে এসে ব্যাগ থেকে পলাশের মোবাইলটা বের করে মাকে দিয়ে বলল – 'পলাশ ভাই আসলে তাকে এটা দিয়ে দিও'। ফেরদৌসি আলম মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেলেন না। তিনি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন, যদি পলাশকে দেখা যায়! তাকে একটি মেয়েকে নিয়ে ঢুকতে দেখে তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না কি হয়েছে। হঠাৎ মিথিলা ঘর থেকে বের হয়ে দৌড়ে ছাদে চলে গেল। আকাশে অনেক মেঘ জমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। সে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

– 'স্যার, আমাকে দেখলে আপু আবার রাগ করলো নাতো? আমি বরং চলে যাই। আমার মনে হয় এই সময় আমাকে দেখে উনি ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন'।

– 'মোটেই তা নয়, চল। যার প্রিয় ফুল তাকে নিজ হাতে দিয়ে এসো'।

কলিং বেল বাজছে। ফেরদৌসী আলম দরজা খুলতেই পলাশ বলল, 'ভাল আছ, খালামনি'?

ফেরদৌসি আলম আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন।

পলাশ বলল, 'আমার ছাত্রী, ইস্‌রাত। ওদের বাড়ীতে অনেক কদম গাছ। আমি কিছু ফুল চেয়েছিলাম ওর কাছে, মিথিকে দেব বলে'।

– 'ভেতরে এস। এই নাও তোমার মোবাইল। মিথির মন খারাপ মনে হল। সে ছাদে'।

পলাশ আর ইস্‌রাত ছাদে উঠে এল। ইস্‌রাত ফুলগুলো নিয়ে মিথিলার দিকে এগিয়ে গেল, পলাশ কিছুটা দূরে। ঝির-ঝির বৃষ্টি পড়ছে। মিথিলা তবু অপলক আকাশের দিকে চেয়ে আছে। ইস্‌রাতকে দেখে মিথিলা তার দিকে তাকাল।

– 'জানো আপু, তোমার ব্যাপারে স্যারের কাছ থেকে যা শুনেছি, তুমি তার চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর। এই নাও, এই ফুলগুলো তোমার জন্য'।

হতভম্ব মিথিলা কি করবে বুঝতে পারছিল না। ইস্‌রাত এবার তার হাতে ফুলগুলো দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি ধর এগুলো। তা না হলে আমার আবার ভীষণ বদ অভ্যাস আছে। অনেক কষ্টে ফুলগুলো এখন পর্যন্ত আস্ত রেখেছি। কদম ফুল হাতে পেলেই ওগুলোকে ন্যাড়া করতে আমার দারুন মজা লাগে'। হেসে ফেলল মিথিলা। সে ফুলের জন্য ইস্‌রাতকে অনেক ধন্যবাদ জানাল।

– 'এবার আমি যাই' বলেই সিড়ির কাছে যেয়ে আবার ঘুরে বলল ইস্‌রাত, 'এই সময়টা তোমাদের। খুব ভাল থেক দুজনে'।

পলাশ, মিথিলা দুজন দুজনের দিকে চেয়ে থাকে।

– 'তোমার টিপটা সরে গেছে'। বলেই পলাশ মিথিলার কপালের সরে যাওয়া টিপটা জায়গামত বসিয়ে দেয়। আনন্দে মিথিলার চোখে জল এসে যায়।

ফুলগুলো পলাশের দিকে এগিয়ে দিল মিথিলা। ফুলসহ মিথিলার হাত দুটো ধ'রে পলাশ বলে,

– 'শুধু ফুল নয়, হাত দুটোও চাই'।

পলাশের আরো কাছে সরে আসে মিথিলা। নিষ্পলক দুজন, নিস্পন্দন। শ্রাবণ নেমেছে, ঝরছে অঝোরে...

কথকতার বাতিঘর কাহিনী

প্রদীপ কুমার দত্ত
ডি.জি.এম., ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

আজকের দিন পার হলেই লেখা জমা দেওয়ার দিন শেষ। আর মাত্র সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে আমাদের মত অপেশাদার নবীন লেখকদেরকে। তাই এক সপ্তাহ খুব টেনশনে ছিলাম এবং এখনও খাতা কলম নিয়ে টেনশনে আছি। কি লিখব? গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমন বৃত্তান্ত, নাটক, কৌতুক? স্টক থেকে কিছুই মনে করতে পারছি না, সব গুলিয়ে ফেলছি। একটা থিম মাথায় আসে তো অমনি আর একটা থিম এসে মাথায় পাক খেয়ে যায়। গোল বাঁধে।

আমার এক সহকর্মী ছিল - রহমান। প্যাকিং-এর সুপারভাইজার। তার কাছে প্যাকিং লিস্ট চাইলে সব সময় সে সময় নিত। এই করছি, করব বলে তার কিছুই করা হত না। শেষে প্যাকিং কার্যকরভাবে শেষ হলেও ততক্ষণে তার প্যাকিং লিস্ট করা শুরুই করতে পারত না।

সাইজ, কালার, সংখ্যাগত তালিকার রো আর কলাম দাগ কাটতে কাটতে এবং শিপিং মার্কের বস্তুগত বিষয়ের উদ্ধৃতি করতে অনাবশ্যক সময় নিত। অথচ এ বিষয়গুলো বাস্তবে প্যাকিং শেষ করার আগেই শতকরা ষাটভাগ কাজ সেরে ফেলা যায়। কিন্তু রহমানকে লক্ষ্য করেছি বরাবরই প্যাকিং লিস্ট তৈরীর জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করা এবং প্যাকিং লিস্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত টেনশনে থাকতে থাকতে কখনও খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি, কখনও বুকে বাতাস আটকে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

আজকে এ লেখা লিখতে গিয়ে রহমান সাহেবের প্যাকিং লিস্টের উদাহরণ কেন দিলাম জানেন? সম্প্রতি আমাদের ব্যাবিলন প্রতিষ্ঠানে একটি গল্প-কবিতা লেখার কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। আমি ঐ কর্মশালার একজন অংশগ্রহণকারী শ্রোতা ছিলাম। কর্মশালার রিসোর্স পারসন ছিলেন বাংলাদেশের প্রথিতযশা লেখক প্রবীন কথা সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক সাহেব।

তিনি গত ৭ই এপ্রিল ২ ঘন্টার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প এবং কবিতা লেখার উপর নাতি দীর্ঘ বক্তব্য দেন। গল্প-কবিতা লেখার উপর যে সকল টিপ্স কর্মশালায় প্রদান করা হয়, তা থেকে উপলব্ধি করি- গল্পের একটি চেনা-জানা প্লট নিয়ে টিপ্সের বৈয়াকরণীক টেকনিক অনুযায়ী প্যাকিং লিস্টের মত যথাযথ তথ্য পূর্ণ করে ফেলব, অমনি প্যাকিং লিস্টের মত সহজ গৎবাধা প্যাকেজিং-এর মত একেকটা গল্প তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে আমার সে কি অবস্থা - গল্পের প্লট খুঁজি, ভাব খুঁজি, আবেগ খুঁজি, মেসেজ খুঁজি কিন্তু যুতসই গল্প আর পাইনা। এখন টেনশনে টেনশনে আমারও প্যাকিং সুপারভাইজার রহমানের মত অবস্থা। খাওয়ায় অরুচি আর বুকে দম আটকে থাকার মত অব্যক্ত যন্ত্রণা।

সেদিন আমাদের ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালক এমদাদুল ইসলাম সাহেব বিগত বছরে প্রকাশিত ব্যাবিলন কথকতার সংখ্যা আমার হাতে দিয়ে বললেন, প্রদীপ, এগুলো পড়ে দেখ। ব্যাবিলন কথকতার সংখ্যাগুলো হাতে নিয়েই উপলব্ধি করলাম - এটিও ব্যাবিলন গ্রুপের একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। সহকর্মী সোহেলীও সেদিন আমাকে ব্যাবিলন কথকতার পরবর্তী প্রকাশনার প্রয়াসে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ জানালেন।

ইতোমধ্যে ব্যাবিলন কথকতা, ২০১০ প্রকাশনা-এর জন্য পর্যদের সভা আহ্বান করা হল। বন্ধুপ্রতীম সহকর্মী সাইফুল হক সাহেবের আহ্বানে এর প্রকাশনার সাফল্য কামনা করে দিক বিদিক নানা বিষয়ে আলোচনা হল এবং প্রকাশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিলেন উপস্থিত পরিচালক এমদাদুল ইসলাম সাহেব। আরও সিদ্ধান্ত হল আমন্ত্রিত অতিথি জনাব সৈয়দ শামসুল হক সাহেবের পৌরহিত্যে এক কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

৭ই এপ্রিল, ২০১০ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.৩০ মিনিটের সময় ব্যাবিলন গ্রুপের প্রধান ভবনের ট্রেনিং সেন্টারে কর্মশালার

আয়োজন হল। প্রায় ষাটের অধিক অতি প্রত্যাশী লেখক-লেখিকা মাত্রাতিরিক্ত গরমে এক ঘন্টারও অধিক সময় ধৈর্য ধরে ঐকান্তিক আগ্রহে অপেক্ষমান, আয়োজিত কর্মশালায় লেখার কিছু মূল্যবান মৌলিক টিপ্‌স পাওয়ার জন্য।

একক বক্তা হিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় লেখক সৈয়দ শামসুল হক বক্তৃতা করছেন, চলছে প্রশিক্ষণের কাজ। আমরা গুণমুগ্ধ শ্রোতা কাম নবীশ লেখক আত্মমগ্ন হয়ে শুনছি। কেউ কেউ নোট নিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ করে আমার সেল ফোন বেজে উঠল। চরম বিরক্তি সহকারে দেখি ফোন সেটের মনিটরে একজন পূর্ব পরিচিত বন্ধুর নাম ভেসে উঠেছে। খুবই বিরক্ত হই। কখনও আমার এমন হয় যে, যদি কোন কর্মশালায় বা অন্য কোন সমাবেশে হঠাৎ নিজের কিংবা অন্যের মোবাইল ফোন বেজে ওঠে বা অন্য কেউ কাঙ্খিত বিষয়ে মনোযোগী না হয়ে ফোন কলে মনোযোগ দেয় তাতে বিরক্তি লাগে নিজের উপর এবং অন্যের উপরও। কোন সভায় কারও মোবাইল ফোনে আলাপ দীর্ঘায়িত হলে আমি খুবই অসহ্য বোধ করি। সহকর্মীদেরকে প্রায়ই উপদেশ দেই, কোন আলোচনা সভায় উপস্থিত হলে তারা যেন মোবাইল সেট বন্ধ রাখে। কিন্তু আমি আমার নিজের বেলায় মোবাইল সেট বন্ধ রাখতে ভুলে যাই। যাক। মনিটরে ভেসে উঠা নাম এবং নম্বর দেখে সাথে সাথে কল বন্ধ করে দেই এবং সেট বন্ধ রাখি।

কর্মশালা শেষে সহকর্মী ডালিয়া আপাকে বলে রেখেছিলাম আমাকে যেন একসাথে গাড়িতে নিয়ে যায়। তাই ডালিয়া আপা আমাকে মোবাইলে খোঁজ করেন। মোবাইল বন্ধ পেয়ে ডালিয়া আপা সরাসরি লোক মারফত খবর পাঠান, গাড়ি রেডি আছে। আমি উঁচুতল ভবন থেকে নেমে গাড়িতে উঠি। গাড়ি চলতে থাকে –

ডালিয়া আপাই প্রথম মৌনতা ভঙ্গ করে কথা বলা শুরু করেন – 'ভেবেছিলাম খুব বোর লাগবে, কিন্তু কিভাবে সময় কেটে গেল একদম টের পাইনি। খুব চমৎকার কর্মশালা হয়েছে। গল্প হয়তো একটু আধটু লিখতে পারবো, কিন্তু বাবা কবিতা! এটা আমার দ্বারা একদম হবে না'।

এরমধ্যেই মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি – বন্ধ। তাড়াতাড়ি অন করে মিস্‌ড কল লিস্ট অনুযায়ী আমার বন্ধু বায়িং হাউজে কর্মরত আলম সাহেবকে রিং ব্যাক করলাম।

আলম সাহেব জানতে চাইলেন তখন কল না ধরে এভাবে কল কেটে দিলাম কেন? ভূমিকা করে বললাম, 'জরুরী কর্মশালায় ব্যস্ত ছিলাম'।

– 'কিসের কর্মশালা?' আলম সাহেবের প্রশ্ন।

– 'কবিতা ও গল্প লেখার কর্মশালা'।

বন্ধুটি হেসে উঠল। 'সে কেমন'?

বললাম, 'সৈয়দ শামসুল হক সাহেব কর্মশালায় রিসোর্স পারসন ছিলেন'।

– 'কোন্ সৈয়দ শামসুল হক'?

– 'প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক, কবি ও গল্পকার, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক'।

– 'কি বললেন তিনি'?

– 'কিভাবে গল্প লিখতে হয়, কবিতা লিখতে হয় এসব আর কি। তিনি গল্পের ব্যাপারে বললেন বর্ণনা থাকবে। গল্প থাকবে। চেনা-জানা বিষয় থাকবে। বাইরের এবং ভিতরের ব্যাপার থাকবে। লম্বা লাইনযুক্ত শব্দ না জুড়ে দিয়ে স্বল্প শব্দে বাক্য গঠন করতে থাকবে। বাক্য ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট আকারে লিখতে হবে। যা লিখবে এর অর্থ থাকতে হবে। বর্ণনার সাথে বিষয়ের অর্থপূর্ণ, বোধগম্য মিল থাকতে হবে। স্বর্গীয় ভালবাসা এমন উপমা ব্যবহার না করাই ভাল। বর্ণনা, বিষয়, চেনা-জানা বিষয়, সংলাপ – এভাবে গল্প লেখা এগোতে থাকবে এবং একসময় একটা অর্থপূর্ণ, সুন্দর, মানসম্মত গল্প লেখা হয়ে যাবে – ব্যস।

– 'ওমা, গল্প লেখা তাহলে এত সোজা!'

- 'হ্যাঁ' ।

এতক্ষণে গাড়ী শ্যামলী চলে এল- ডালিয়া আপার বাসার কাছাকাছি । ডালিয়া আপা গাড়ী থেকে নেমে গেলেন । আবার গাড়ী মূল রাস্তায় ঘুরে আসতে লাগল । মোবাইলে তখনও গল্পের কথা চলছে - 'গল্পে অর্থপূর্ণ কথা থাকবে' ।

- 'আমার মনে পড়ে কেউ কেউ মাঝে মাঝে অর্থহীন সংলাপ বকে । যেমন বলে - কি সুন্দর বাতাস! বাতাসের কি লাল-নীল-সবুজ রং আছে যে সুন্দর দেখাবে? তবু কথার সূত্র ধরে আমিও মাঝে মাঝে বলি - আহা! কি সুন্দর বাতাস । কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক সাহেবের টিপ্‌স শুনে মনে হল - তাইতো! আমরা মনের অজান্তে কত অর্থহীন কথা বলি, লিখি । কিন্তু সার্থক গল্প লেখার জন্য চাই অর্থপূর্ণ শব্দ ও সংলাপ' ।

ও পাশ থেকে আলম সাহেব আবার বলল, 'আচ্ছা, গল্পের টিপ্‌স তো শুনলাম এবার কবিতার টিপ্‌স বলুন তো' ।

- 'হ্যাঁ ভাই এটা আরও কঠিন কিন্তু খুব মজার' ।

- 'কেমন-কেমন কঠিন আবার মজার' ।

- 'হ্যাঁ বন্ধু হ্যাঁ, কবিতা লিখতে হলে অংক করে সংখ্যা রাশি গুণে গুণে অক্ষর, শব্দ, বাক্য গঠন করতে হয় । এর সাথে ছন্দ, বাক্য, মনের ভাব তো আছেই । এটা কিন্তু কখনই এর আগে জানা ছিল না । শব্দ তৈরী করে শব্দ এবং অক্ষর গুণে নিতে হবে'।

- '৪+৪+২+৪ = ১৪

৪+৪+৪+৪+২ = ১৮ } এভাবে কল্প জগতে কথার পিছে কথার মালা বুনতে হবে' ।

কিন্তু কবিতার ছন্দে অংকের জটিল হিসাব কোনভাবেই মেলাতে পারছিলাম না । জল পড়ে, পাতা নড়ে - এমন সহজ শব্দগুলোও যেন অংকের মত নিরস এবং কঠিন লাগছিল ।

কর্মশালার কাজ শেষ । সবাই আশ্বস্ত করলাম, যার যার লেখা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দিব । কিন্তু দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায় তবুও লেখা শেষ হয় না । এবারের মত এর ধারাবাহিকতা কামনা করে আগামী বছর আরও মানসম্মত একটা লেখা লিখব - এই দৃঢ় প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা নিয়ে এখানেই লেখার সমাপ্তি টানছি ।

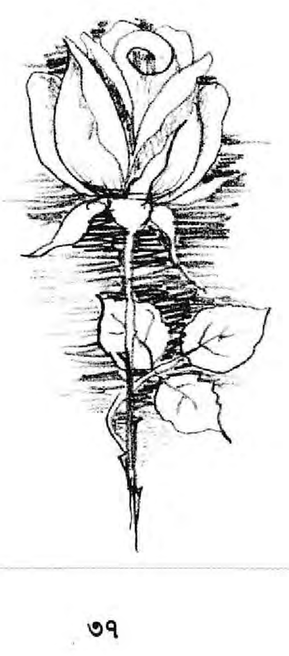

দেখা হয় না চক্ষু মেলিয়া

এমদাদুল ইসলাম

পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ

– 'স্যার আপনার একজন গেস্ট এসেছে'। ইন্টারকমে রিসিপশনিস্ট মেয়েটি জানায় নিচ থেকে।

– 'আমার গেস্ট! কে এসেছে?' জানতে চাই আমি।

– 'হাজারীবাগ থেকে মোহাম্মদ জামাল মিয়া'। জানায় ফ্রন্ট ডেস্কের ডলি।

– 'এমন কাউকে চিনি না আমি ডলি, স্যরি'। ফোন রেখে দেই আমি। কত যে উটকো লোক আসে! – আবার ফোন বাজে।

– 'আবার কি হল'? আমার কন্ঠের বিরক্তি চাপা থাকে না।

– 'স্যার, জামাল মিয়া বলছে আপনি নাকি তাকে চেনেন। গত হরতালের দিন আপনি নাকি ওর রিকশা চেপে অফিসে এসেছিলেন'।

– 'রিকশাওয়ালা.....!' স্মৃতির পাতা হাতড়াতে থাকি। হ্যা, মনে পড়েছে।

তিন বছর। প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম এক সময় দীর্ঘকাল ধরে হরতাল আমাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে ছিল। বছর তিনেক বা তার কিছু বেশী সময় পরে ডাকা হরতালে বিরক্ত হলাম খুব। বিরক্তিটা হরতাল কেন ডেকেছে তার জন্য নয় – হরতালে অফিস যাওয়ার বিড়ম্বনার কথা ভেবে। ল্যাপটপ কম্পিউটারের ব্যাগ ঘাড়ে করে সকাল ন'টার দিকে বের হলাম বাসা থেকে।

না, বাসার সামনে কোন খালি রিকশা চোখে পড়ল না। হাঁটা ধরলাম লেকের পাড় ধরে। জুনের আকাশ মেঘ শূন্য। এই সকালেই যেন আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য দু'হাতে। তিন মিনিটেই কপাল বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরতে শুরু করল। এর মধ্যে ক'টা রিকশা চোখে পড়ল বটে তবে তার কোনটাই খালি নয়। বিগত হরতাল দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। আট নম্বর ব্রিজ না আসা পর্যন্ত কোনবারই রিকশা বাগাতে পারিনি। কখনোতো কলাবাগান বাস ষ্ট্যান্ড পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে একটা রিকশা ধরার জন্য। হরতালে বাস-স্কুটার সবাই মানা করে। বোমা পড়তে পারে।

ব্রিজ পর্যন্ত আসতে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ফেসিয়্যাল টিস্যুর চল হবার আগে পর্যন্ত রুমাল থাকত সংগে। এখন আর তা থাকে না। কাজেই ঘামে ভেজা চশমা খুলে আস্তিনে মুছি। ব্রিজের গোড়ায় একটা খালি রিকশা চোখে পড়ে। কিন্তু রিকশাওয়ালা যেভাবে যাত্রী সীটে বসে চালকের সীটের উপর দু'পা তুলে দিয়ে বিশ্রাম করছে তাতে মনটা খারাপই হয়ে গেল। এই ভংগীতে থাকা রিকশা চালকদের সাধারণতঃ যাত্রী ধরার তাড়া থাকে না। হাতের চেটোয় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে যাই তাও।

– 'যাবে.....ন নাকি ভাই'? তুমিই বেরোচ্ছিল মুখ দিয়ে তবে সামলে নেই কি ভেবে।

– 'কোথায় যাবেন'? কাঁচা পাঁকা ঝাঁকড়া চুল মাথায় করে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মাখা মুখটি ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে রিকশাওয়ালা। বসার ভংগী অপরিবর্তিত।

– 'এশিয়া সিনেমার কাছে'। মিরপুর বাংলা কলেজের কাছে এসব বললাম না পূরনো অভিজ্ঞতার কথা মনে করে। হরতালের দিনে সাধারণতঃ রিকশাওয়ালারা ওসব ঠিকানায় যেতে চায় না।

– 'চিনি না সাব'। সীট থেকে পা নামাতে নামাতে বলে লোকটা। 'না, ওদিকে যাবনা'-র চাইতে অনেক ভাল।

– 'সমস্যা নেই – আমি চিনিয়ে নেব। একদম সোজা রাস্তা'। আশ্বাস দেই আমি। আর কোন খালি রিকশা দেখছি না তাই একটু মরিয়া হয়েই বলি।

– 'একশ টাকা দিতে হবে'। রিকশাওয়ালার ডিমান্ড শুনে চমকে উঠি আমি। মাথা খারাপ নাকি?

– 'জায়গা চেনেন না অথচ একশ টাকা হাঁকছেন?' খেঁকিয়ে উঠি আমি। বলি, 'কোন হরতালে বিশ টাকার বেশী দেইনি'। এবার রিকশাওয়ালা যেন অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, 'বিশ টাকা? কবে দিয়েছেন সাব?'

– 'কেন গত হরতালে'।

– 'তিন বছর আগের বাজার এখনো আছে সাব'? বলে লোকটা লেকের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

ব্যাটা নিশ্চয় চাপা দিচ্ছে আর আমাকে একেবারে আনাড়ী ভাবছে। এত সোজা না আমার ঘাড় মটকানো।

– 'ত্রিশ টাকা পাবেন' বলে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। সাধারণতঃ এরকম পরিস্থিতিতে রিকশাওয়ালারা ধীর গতিতে পিছু নিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে 'আর পাঁচটা টাকা দিয়েন' বলে রাজী হয়ে যায়। আজ ব্যতিক্রম হ'ল। আসছেনা লোকটা। ঠিক তখন উল্টো দিক থেকে আরেকটা খালি রিকশা আসতে দেখলাম। থামালাম লোকটাকে। জিজ্ঞেস করলাম যাবে কিনা। ঘাড় বাঁকিয়ে জানাল যাবে। গন্তব্য বললাম। চেনে সে।

– 'কত দিতে হবে'? জানতে চাইলাম সতর্কভাবে।

– 'একশ বিশ টাকা দিয়েন'।

পাল্টা দাম বলার মেজাজ বা রুচি কোনটাই ছিল না আমার। হাঁটতে থাকি কলাবাগান বাস স্টপেজের দিকে। ততক্ষণে পরনের সার্ট ভিজে সপ্ সপ্ করছে। বিরোধী দলের মুন্ডু কপ্‌চাতে কপ্‌চাতে কপালের ঘাম মুছি আবার।

– 'আসেন সাব, নব্বই টাকা দিয়েন'। চমকে ফিরে দেখি সেই আগের রিকশাওয়ালা কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি আর কথা বলিনা। সুবোধ বালকের মত রিকশায় উঠে বসি।

মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে রিকশা এগিয়ে চলে। রোদ থেকে বাঁচতে হুড তুলে দেই মাথার উপর। বিপরীত দিক থেকে লাগা হালকা বাতাসে ঘাম শুকাতে থাকে আর আমার তাতানো মেজাজও ঠান্ডা হতে থাকে।

পেছন থেকে রিকশা চালককে লক্ষ্য করি। বয়স চল্লিশের কোঠায় হবে। মাথার ঘন ঝাঁকড়া চুলের অর্ধেকটাই সাদা। গায়ের চেক সার্টটা রঙ জ্বলা, পরনে লুঙ্গি – সব মিলে আর দশটা রিকশা চালকের মতই।

– 'সোজা যাব, সাব'? রাসেল স্কয়্যার–এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে লোকটা।

– 'হ্যা, সোজা যেতে থাক। ডান–বাম করতে হলে আমি বলব'। লোকটাকে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে এনে তৃপ্তি পাই বেশ।

– 'বাড়ী কই'? জিজ্ঞেস করি।

– 'হাজারীবাগ'। উত্তর আসে।

– 'আরে না, দেশের বাড়ী কোথায়'?

– 'বগুড়া সাব'।

– 'পরিবার দেশে থাকে'?

– 'না, সবাই মিলে থাকি হাজারীবাগ'।

– 'ছেলে-মেয়ে ক'টা'?

– 'দুই মেয়ে এক ছেলে'।

– 'স্কুলে যায়'?

– 'বড় দু'জন যায় সাব। ছেলে ছোট'।

কথায় কথায় এক সময় অফিসের কাছে চলে আসি। পঁচিশ মিনিটের পথ চলা শেষে ভাবি রিকশা চালক হিসেবে লোকটা খারাপ নয়। একশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলি বাকী টাকাটা রেখে দিতে। আরো বলি কখনো কোন সমস্যা হলে যেন চলে আসে এই ঠিকানায়। এমনটা বলা আমার স্বভাব নয়। তাও কিভাবে যেন কথাগুলো বেরিয়ে যায় মুখ থেকে। লোকটা মুখ তুলে চায় আমার দিকে। কিছুটা অবাক হয়েছে বোধ হয়।

– 'স্যার, জামাল মিয়াকে পাঠাব'? ডলির কথায় সম্বিত ফিরে আসে আমার। ফোন তখনো কানে চেপে ধরা। মুহূর্তে বিরক্তি চলে আসে রাজ্যের। লোকটার প্রতি সেদিন যে সহানুভূতি তৈরী হয়েছিল তা আজ উবে যায় দ্রুত। আসলে এমনই হয়

এসব লোক। নিছক ভদ্রতাবশতঃ বলেছিলাম সমস্যা হলে এসো। আর দশ দিন না যেতেই এসে হাজির! সাহায্য চায় নিশ্চয়ই। চরম বিরক্তি নিয়ে বললাম, 'একশটা টাকা দিয়ে দাও লোকটাকে। আর উপরে এসে টাকাটা নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে'। বলে ফোন রেখে দেই আমি।

একটু পরেই ডলি আসে আমার রুমে। 'দিয়েছ টাকাটা? এই নাও....'। বলে পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করি।

– 'না, স্যার টাকা নেয়নি জামাল মিয়া। আসলে কোন সাহায্যের জন্যে আসেনি লোকটা।' বলে ডলি।

– 'কেন এসেছিল তাহলে'? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

– 'স্যার আপনি নাকি আপনার মেয়ের অসুখের কথা বলেছিলেন জামাল মিয়াকে? ওর মেয়ে তা শুনে রক্ত দিতে চেয়েছে। বলল, আরও আগেই আসত। রক্তের গ্রুপ করাতে দেরী হয়ে গেছে। জামাল মিয়ার বড় মেয়ের রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ।' এক দমে বলে একটা চিরকুট এগিয়ে দেয় ডলি।

ডলি নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় আমার ইশারায়। আমার মনে পড়ে যায় ঐ দিন গল্প করতে করতে এক সময় বলেছিলাম লোকটাকে আমার একমাত্র মেয়ের অসুস্থতার কথা। রিকশাওয়ালার নানা কষ্টের কথা শুনতে শুনতে খানিকটা শান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই বলেছিলাম – আমার একমাত্র মেয়ে অপর্ণার থ্যালাসেমিয়ায় ভোগার কথা। ওকে মাসে মাসে রক্ত দেবার কথা কোথাকার এক হত দরিদ্র রিকশাওয়ালা ও তার শিশু কন্যার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে ভাবিনি। এই শ্রেণী শুধু নিতেই জানে সারা জীবন তাই ভেবে এসেছি। সমাজের নিচ তলার এই হতভাগ্য মানুষগুলোর আমাদের মত উপরতলার মানুষদের জন্য কিছু দেয়ার থাকতে পারে বুঝিনি এর আগে।

আমার আদরের কন্যা অপর্ণার পাশা-পাশি জামাল মিয়ার না দেখা মায়াবতী কন্যাটির মুখচ্ছবি কল্পনা করি। একসময় দৃশ্যপট ঝাপসা হয়ে আসে আমার। অপর্ণার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ। কিন্তু তাতে কি!

(কাহিনিটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক – লেখক)

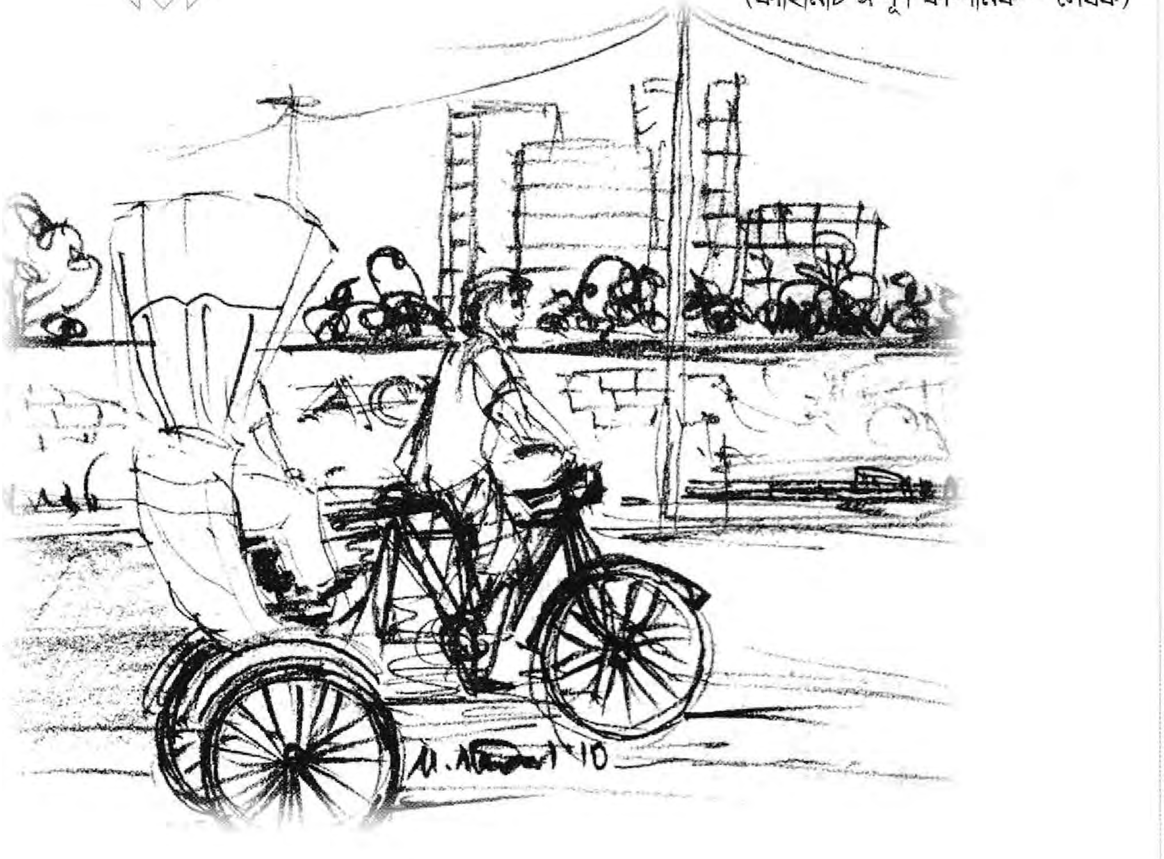

Compliance, Minimum Wage & Government Initiatives in Our RMG Sector

Mohammad Hasan
DGM, Babylon Group

The term "compliance" is one that promptly reminds you of our RMG industry. Compliance with buyers' codes of conduct is the prime condition in their work orders to the local garment factories. This code of conduct is mostly similar to our local and international labour laws. The basic elements of compliances are incorporated in our local laws. It's not the issue of buyer's interest but to protect local workers' and owners' rights.

The compliance includes social, technical and environmental issues. But generally compliance refers to social compliance. The major areas of compliance are -

Wages - follows a grading system for the industry.
Payment - properly, timely and regularly.
Working hours - as stipulated in the labour law.
Health & safety - to ensure all safety measures and maintain a healthy & hygienic environment.
Child and forced labour - no child and forced labours are allowed in any work process.
Holidays & Leaves - compulsory weekly holiday, festival leaves, maternity leave.
Employment - workers and staffs are provided with appointment letters clearly defined terms and conditions of employment and to provide ID card to them.

These all are absolutely for the workers who are behind the machines and manufacturing processes. Presence of above safety net makes the workers motivated toward discharging their duties, reduces workers turnover, makes the workers loyal and committed to the organization, grows 'my' feelings amongst them and finally owners get optimum output with required quality.

The buyers of our RMG industry are chiefly from developed countries. As buyers from developed countries, they think, they have universal social corporate responsibility. They want to be sure that every manufacturing unit in their supply chain follows locally and internationally recognized procedures, rules and laws. The ultimate consumers of our products want to build their confidence that work forces that make their garments live well.

Why is this so difficult for the factories to observe this particular compliance requirement? To maintain shipment schedule (delivery of goods as committed with buyer) it is necessary to have raw materials in time, uninterrupted power supply, sufficient and skilled work forces. Also it is necessary to have worker migration under control, reasonably good and efficient infrastructure - roads, highways, port, committed and dedicated officials in customs, bank, EPB and in other concerned offices.

Among the major areas of compliance most of the factories fail to comply on " working hour" issue. A worker is allowed to work maximum two hours extra by law beyond his/her normal working hours a day. For overtime hours factory has to pay at double the rate than that of normal working hours and in return factory usually gets very low productivity during overtime. Moreover workers are to be given snacks during overtime hours.

Generally factory owners have no reason to oppose compliance, as it does not conflict with achieving their business targets. On the contrary if everything in the factory goes well then they can also enjoy a comfortable and easy life for themselves also.

Wage/salary increment in the manufacturing industry is a regular practice. But the question is how the increments help the beneficiary. If the commodity prices also go up with the wage hikes, house rents climb higher as well then how far these increments help change the fates of the workers?
It is universal that the industry owners try to pay as less as possible to their employees to minimize production cost and maximize their profits. On the other hand employees bargain for as maximum as they can achieve. Here the government has a role to play. Government succeeds when it can bring a win-win situation to both the parties. Here we should keep in mind that major parties in private sector are the employers and the employees.

Mere increase on wages doesn't guarantee the well being of the workers in their daily lives. We have always seen that any announcement of new pay scale for the government service holders instantly increases the prices of daily commodities. Every fiscal budget (July - June) declaration in our national parliament automatically legs up the market prices of almost everything that sells in the market including the daily consumables. Those experiences tell us that the implementation of new wage structure in RMG sector will give another shake hiking prices in the kitchen market, house rent, transport fair, etc. If it is so then what is the use of this revision of wages? Better tomorrow is a far cry for the lives of the workers. Probably it would have been more useful if the workers could raise their voices to curb the unreasonable price hike in the market of commodities and services. Steady market price with enhancement of wage only can benefit the movement. Otherwise workers movement will remain a mere formality from time to time eventually achieving almost nothing out of it.

With time our RMG business and export volume increase but to match the growth infrastructural improvements don't take place. Energy, development of roads & highways, ports - both air and sea etc. are the big challenges in front of our government. Adequate improvements on those would encourage the Entrepreneurs to expand and set-up more factories and thus contributing to solving unemployment problems and helping the economy. Hazrat Shahjalal International Airport is the only airport to handle our air cargos. The scarcity of space and insecurities of goods there are burning issues that need to be taken care of. Valuable raw materials are kept in the open air. Pilferage is a common phenomenon in the airport. Getting goods intact from the airport is a rare luck. On the other hand exceptionally high congestion in the seaport at Chittagong has earned the port the status of being one of the slowest in the world.

RMG industry in our country so far has been enjoying a clear price competitiveness against our competitors in China, Vietnam or India. But this competitiveness is going to be narrowed down significantly as the new wages are implemented from November this year. Moreover those countries enjoy from other advantages that we don't have enough. Those are forward linkage industries, very short lead-time, efficient port facility, better infrastructure and higher productivity in the factories.

A recent study at a 15-line woven tops factory in Dhaka reveals that the current load shedding has increased costs by additional Tk 100,000.00 per month in that factory. Generating power using diesel generator costs around Tk 13.75/unit against Tk 4.43/unit while factory uses public utility source. Overtime and workers' refreshment expenditure for that factory per month comes to a staggering Tk 40,00,000.00

Government has a vital role to play to ensure a congenial investment environment for the entrepreneurs by providing all logistic and infrastructural supports to them. Government should be responsible for ensuring safety and security of life, roads and highways, energy, efficient and effective transit points - sea & airport etc.

In the factories our workers' efficiency is very low and usually not more than 40% as we do not have sufficient technical training centers for the workers. Government has no control over monetary inflation rather lack of effective monitoring on commodity prices, presence of strong syndication in bazaar system heading us to an uncertain destination. Actually these are the areas where URGENT government initiative is indispensable.

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি

Babylon Director Mr. Neesar Ahmed is taking 'Best Labour Friendly Factory' Award 2010 of BKMEA from Commerce Minister Muhammad Faruk Khan (ব্যাবিলন পরিচালক জনাব নিসার আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের কাছ থেকে বিকেএমইএ-র 'সেরা শ্রমিক বান্ধব কারখানা' ২০১০ পুরস্কার গ্রহণ করছেন)

Tema is giving `Most Improved Supplier' Award 2010 to Babylon Group (ব্যাবিলন গ্রুপ বিদেশী ক্রেতা টেমার 'মোস্ট ইমপ্রুভড সাপ্লায়ার' পুরস্কার ২০১০ গ্রহণ করছে)

Writer Syed Shamsul Haq and Babylon Directors are unwrapping the 4th issue of Babylon Kathakata (কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক ও ব্যাবিলন পরিচালকবৃন্দ ব্যাবিলন কথকতা-এর ৪র্থ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করছেন)

A Trade Delegation from Hongkong consisting of 24 members visited Babylon Group (হংকংয়ের ২৪ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের ব্যাবিলন গ্রুপ পরিদর্শন)

One of the scholars is sharing her feelings in the 2nd Scholarship Distribution Ceremony 2010 of Babylon Group (ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তির ২য় ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২০১০-এ বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন ছাত্রী তার অনুভূতি ব্যক্ত করছে)

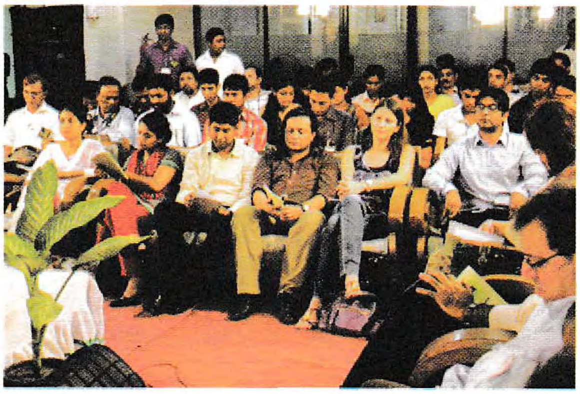

A partial view of the audience at 2nd Scholarship Distribution Ceremony 2010 of Babylon Group (ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তির ২য় ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২০১০-এর একটি দৃশ্য)

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ :

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ
- সুরভী গার্মেন্টস লিঃ
- অবনী ফ্যাশন্স লিঃ
- অবনী টেক্সটাইলস লিঃ
- অবনী নিট ওয়্যার লিঃ
- জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিঃ
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ
- ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ (ট্রেন্ডজ্)
- ব্যাবিলন প্রিন্টারস লিঃ
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিক্স

Head Office :

2-B/1 Darus Salam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh
Tel : 8023495-6, 8023462-3 (Off)
9007175, 9010533, 8011089 (Fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com